প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮,

প্রকাশক : উইলিয়াম কেরী স্টাডি অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার
১৪/২ সদর স্ট্রিট, কলিকাতা ১৬

মুদ্রণ : বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
৪৮বি শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪

উৎসর্গ

পরম আরাধ্যা মাতাঠাকুরাণী

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী রায়চৌধুরীর চরণ-কমলে

এই দীন উদ্যোগ অর্পিত হলো।

নান্দীমুখ

গত এক দশক কাল জুড়ে—উইলিয়াম কেরী স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে দেশজ তথা আধুনিক সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলো নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণার কার্যসূচী অনুসৃত হয়ে আসছে—নাটক তার অন্যতম।

এ বিষয়ে সেন্টার শুধুমাত্র নিজস্ব সংগঠনের প্রচেষ্টাগুলোতেই উৎসাহ এবং উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ না রেখে—দেশ জুড়ে, বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনে চর্চিত বিবিধ নাট্য-প্রয়াসগুলোকে সম-পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে এবং সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সেন্টার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য নাট্যভঙ্গি—কাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। সেই কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য অবশ্যই—নাট্যকর্মের ব্যাপারে ইতিহাস চেতনা। যার একটি স্তরে রয়েছে ভারতীয় নাট্য ইতিহাসের প্রতি গভীর মনোযোগ; অপর স্তরে প্রধান নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসে নিপীড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি।

যেহেতু উল্লেখিত প্রচেষ্টাটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত একান্ত ভাবেই সেন্টারের একক উদ্যোগ হিসেবেই রয়ে গেছে, তাই এই মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, সেই কাঠামোর বাইরে যে ব্যাপক নাট্যকর্ম চলছে সেগুলোর সঙ্গে সঠিক অর্থে কোনো তুলনা করে দেখার সুযোগ হয়নি। প্রধানত সেই তুলনা এবং বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ হতেই বর্তমান নাট্য-সংকলনটির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সংকলনের নাটকগুলোর রচনাকার শ্রীরঞ্জিত রায়চৌধুরী সেন্টারের সাংস্কৃতিক বিভাগের অন্যতম প্রধান সংগঠক হওয়ার ফলে—সেন্টারের এই বিষয়ে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং উপায় সকলের মধ্যে একটি সঠিক সংযোগ ঘটাতে পেরেছেন। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের প্রারম্ভিক পর্বে এই সংকলনের একাধিক নাটকের অনুবাদকে আশ্রয় করে তাঁদের যাত্রা আরম্ভ করেছেন।

প্রস্তুতি প্রকাশের অপর উদ্দেশ্য নতুন নাট্যগোষ্ঠীগুলো সচরাচর অভিনয়-যোগ্য নাটকের অভাবজনিত যে সমস্যার সম্মুখীন হন সে ব্যাপারে সাধ্যমতো সহযোগিতা করা। মিশ্ররীতিতে লেখা সংকলনের একাধিক নাটক অনুরূপগোষ্ঠীগুলোর কাছে আকর্ষক হতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কভুগৃহজাত ও অন্যান্য গত দশ বছর আমরা নাটক নিয়ে যে চিন্তাভাবনা এবং কাজ করেছি তার প্রত্যক্ষ ফসলের একটি নমুনা হিসাবে গৃহীত হবে বলেই আমি আশা রাখি।

ভূমিকা

গত কিছুকাল ধরেই আমাকে এই একটি ভাবনায় পেয়ে বসেছিল—এখানে ওখানে এই যে আমাকে নিয়ে নানাজনার প্রশ্ন, এর একটি যথাযথ উত্তর কি ভাবে দেওয়া যায়। প্রশ্নকর্তারা প্রকারান্তরে যা বোঝাতে চেয়েছেন সহজভাবে তাকে দাঁড় করাতে হলে বলতে হয়, তাঁরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি নাটকের কে? ভাবখানা, যেন নাটকের কেউ হওয়াটা নিতান্তই এঁদের কৃপার ওপর নির্ভর করে।

অনেকটা উত্তর দেওয়ার সততা বোধ থেকেই আমি এই সমস্ত মহাশয় ব্যক্তিদের আমাদের নাট্যনিবেদনগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে দলটিকে কেন্দ্র করে আমার কাজকর্ম সেই কোরাস-'৮২ প্রচলিত অর্থে বড় দল নয় বলে, তাদের অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েও রঙ্গালয়ে উপস্থিত হননি।

কখনো কখনো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ভাষাভাষি নাট্যকর্মীদের মধ্যে কর্মশালা পরিচালনার সুযোগ যখন এসেছে, আমি এঁদেরই কোন কোন মহোদয়কে আমরা কিভাবে কাজ করে থাকি তা সরেজমিনে দেখে আসার জন্য অনুরোধ করেছি। কেননা, কাজের মধ্যেই মানুষকে ঠিকঠাক চেনা যায়। আমার দুর্ভাগ্য যে এ ক্ষেত্রেও আমি কৃতকার্য হতে পারিনি। উল্টে নাটক বিষয়ক কর্মশালা নিয়ে বহু সময়ই এই সমস্ত প্রতিভাদের দিক থেকে ব্যাজ-বিদ্রুপ শুনতে হয়েছে।

আর একটা উপায় অবশ্যই আমার ছিল। নিয়মিত নাটক লিখে সেই নাটক বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠিকে দেওয়া। কিন্তু পদ্ধতি হিসেবে এই কাজ আমার নিজের খুব মনঃপুত হয়নি। আমি নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরী করবো—তার কোন একটি উটকোদল, হঠাৎ বিশারদ হয়ে উঠে, সেটিকে কাঁটাছেঁড়া করবে এবং এর জন্য একবারও আমার অনুমোদনের কথা ভাববে না, কথাটা কল্পনা করতেই আমি বিষন্ন বোধ করেছি। আমার মনে হয়েছে একজন নাট্যকার

একখানি অসহায় হতে পারে না। একজন চিত্রশিল্পীর চিত্রে তুলি বোলানো যাবে না, একজন গীতিকারের সুরে সামান্য অদল বদল অপরাধ, অথচ একজন নাট্যকারের নাটক পরিবর্তন পরিবর্জন সাপেক্ষ শিল্প, এ মনোভঙ্গিতে কোথাও জোরখাটানোর প্রবণতা আছে বলেই আমার মনে হয়েছে।

আমি অবশ্যই প্রশ্নকর্তাদের কতগুলো ঘটনার দীর্ঘ তালিকা দিতে পারতাম। বলা যেত গত ত্রিশ বছরে আমি কম করে যে পঁচিশ খানা বিভিন্ন সময়ে নাটক লিখেছি তার সবগুলোই একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। কিম্বা এমনও উল্লেখ অসম্ভব ছিল না যে আমি ত্রিশ বছরে পথেঘাটে, পাড়ায়, পার্কে, রাজনৈতিক দলের মঞ্চে এবং প্রতিষ্ঠিত মঞ্চ মিলিয়ে কম করে তিনশো বার কোন না কোন ভূমিকা পালন করেছি।

এমন কি সারা ভারত জুড়ে, বিভিন্ন নাট্যদলের কাজ দেখার যে দুর্লভ সৌভাগ্য গত দশবছর আমার হয়েছে সে সবও উল্লেখ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু অনুরূপ কোনও প্রমাণ দানের অসম্মানের ব্যাপারে আমি চূড়ান্ত কোনঠাসা অবস্থাতেও আপোষ করতে উৎসাহ পাইনি। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, প্রাথমিক ভাবে আমাদের কাজকর্ম নিয়ে অকারণ যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল, সেই বিরক্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আমাকে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করতে হয়েছে। এই রকম একটি ক্ষুদ্র সংকলন যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবু বাস্তবে এই উদ্যোগ গ্রহণ ভিন্ন আমার সামনে অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না।

প্রশ্নটা যদি আমি যথার্থ নাট্যকর্মী কি না, কিম্বা আমাদের দল গ্রুপ থিয়েটারের আওতায় পড়ে কিনা, এই রকম কোনও স্তরে এসে থেমে থাকতো —তাহলে আর যাই হোক এই উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ প্রশ্নকে আশ্রয় করে জানতে চাওয়া হয়েছে—আমি কতদূর প্রগতিবাদী, আমাদের দলটি কি পরিমাণ আধুনিক, নাটকের ক্ষেত্রে কোন আন্তর্জাতিক-মনস্কতা আছে কি না, আমার সচেতনতা ইত্যাদি।

অনিবার্যভাবেই এ সমস্ত প্রশ্নের প্রধান লক্ষ্য যদিও আমি, তবু এই প্রশ্নের প্রভাব থেকে আমাদের দলটি রেহাই পায়নি। সে কারনেই আমার মনে হচ্ছে যেহেতু আমার সহকর্মী বন্ধুরা আমার ওপর গভীর আস্থা রাখেন, তাই, তাদের যেকোন সম্ভাব্য আঘাত থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

বর্তমান সংকলনে যে পাঁচটি নাটক স্থান পেয়েছে তার চারটিই আমি রচনা করেছি আমার নিজের দল কোরাস ৮১-র জন্য। আমার সহকর্মী বন্ধুরা এগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই সাধ্যমতো পরিশ্রম করেছেন, এবং বহুবার নাটক কটি মঞ্চস্থও হয়েছে।

• স্বভাবতই নাটককটির গঠনরীতি, প্রতিপাদ্য আঙ্গিক, ঘটনা চরিত্র সব কিছুই পরিকল্পিত হয়েছে দলটির ক্ষমতা-অক্ষমতার কথাকে স্মরণ রেখে। তবে সে সবই করা হয়েছে, দলকে নাট্যশিল্প সম্পর্কে প্রস্তুত করার অভিপ্রায়ে। আমি কখনোই ভাবিনি এই সমস্ত নাটক নিয়ে দল শহরের অভিজাত মঞ্চগুলোর কোন একটায় নিয়মিত প্রদর্শনী করে যাবে।

নাটকটিকে কেন্দ্র করে যাতে বিশেষ করে কোরাস-৮১ নাট্যশিল্প নাট্য-দর্শক এবং নাট্যকর্মীদের সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হতে পারে তার জন্যই এই সব আয়োজন করা হয়। এটা আজ ঘটনা যে নাটকটি একটি নির্দিষ্ট স্তরে অপরাপর নাট্য-উদ্যোগের কাছে কোরাস—৮১র ঘরানা হিসেবে পরিচিত হয়েছে। অন্য স্তরে অবশ্যই কোরাস—৮১ আশ্রিত অভিজ্ঞতা সারাদেশ জোড়া যে বিবিধ এবং বিচিত্র নাট্যরীতি নীতি নিয়ে কাজকর্ম চলছে তার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে রীতির কথাটাই বলি।

আমার মতে সংকলনে স্থান পাওয়া নাটকগুলি মিশ্ররীতি আশ্রিত। এর কাঠামোগত দিক নিয়ে বিচারে বসলে দেখা যাবে, না একে প্রচলিত নাটকের ছকে ফেলা যাচ্ছে, না চিহ্নিত করা যাচ্ছে অত্যাধুনিক বলে।

নাটককটিতে কাঠামোগত ভাবে সেই সমস্ত উপকরণই স্থান পেয়েছে যা নাট্য-প্রতিপাদ্য এবং নাট্য-শরীরের প্রকাশ ভঙ্গিমার ক্ষেত্রে অনিবার্য। বাহির কাঠামোর বেলায় প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যখন যা প্রয়োজন, এই মনোভাব কাজ করেছে। কোন বিশেষ তত্ত্ব বা নিয়মের অনুসরণ করা হয়নি। তবে ভিতর কাঠামোতে শব্দ, বাক্য, উচ্চারণ, তথা বিভিন্ন আবেগের ব্যবহার যতদূর সম্ভব দেশজ ঐতিহ্যের অনুসারী রাখার চেষ্টা হয়েছে। ঘটনা এবং চরিত্ররা এসেছে অনায়াসে. কোন কিছুই নিছক অঙ্গসজ্জার দাবী মেটানোর জন্য আসেনি। নীতির ব্যাপারে অবশ্যই অতিরিক্ত সতর্কতা রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। নাট্যকর্মীর যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব আছে, একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলার চেষ্টা করেছি। কোন রকম ভান না করেই যা আমার উপপাদ্য—অর্থাৎ সমাজের লক্ষকোটি নিপীড়িত মানুষের যে বিড়ম্বিত জীবন, তাদের যে কঠোর সংগ্রাম, সেই লড়াই-এর পক্ষ নিয়েছি।

পরিকল্পিত ভাবে না হয়েও চারটি নাটকেই অন্যতম প্রসঙ্গ হিসেবে যুক্ত এসেছে। চরিত্র এবং সংলাপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গেই যারা অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত তাদের মর্যাদাবোধ তথা অহঙ্কারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে নাট্যরীতি এবং নাটক আশ্রয়ী নীতির এই সচেতন সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসকে ঘিরেই শেষ পর্যন্ত আমাকে বিচিত্র এক বিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যতকাল নাটক লেখা এবং কোরাস-৮১-র মাধ্যমে তা পরিবেশন নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, ততকাল, প্রায় নিরুপদ্রবেই কেটেছে আমাদের।

বিপদ দেখা দিয়েছে এই গণ্ডি অতিক্রম করতে গিয়ে। অনেকেই এই সাহসকে সুনজরে দেখেননি। তাঁদের মতে, জাতীয় স্তরে তাঁরাই নাট্যকর্মী, আমার মতো অকিঞ্চনের পক্ষে বড় জোর আঞ্চলিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে ওঠার পর কারণ অনুসন্ধানে এগিয়ে আমাকে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় বর্তমান সংকলন সেই অভিজ্ঞতার প্রতিবাদও বটে।

হাল আমলের কাজকর্ম এবং সচিত্র গ্রন্থাবলীর ঢালাও প্রসারের ফলে যেমন ক্রমশই সমাজ শরীর থেকে পঠনপাঠনের শ্রমসাধ্য অভ্যাসগুলোকে পরিবর্তিত করে চলেছে হুবহু সেই ভাবে নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে দেশজোড়া এক চূড়ান্ত ঔর্দ্ধব মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কাজকর্মের প্রধান শক্তি যেমন চমক, এবং সচিত্র কাহিনীর আকর্ষণ দৃশ্যময়তায়, অনুরূপভাবেই বর্ণাঢ্য দৃশ্য এবং মুহুর্মুহু চমক-আশ্রয়ী এক নাট্যকলা প্রাধান্য পেতে চলেছে। এই পদ্ধতি, নাট্যশাস্ত্র, নাট্যসাহিত্য, সামাজিক মানুষের দৃশ্য ব্যবহারের অভ্যাস এই সমস্ত মৌলিক ব্যাপারগুলোকে সম্পূর্ণ অবহেলার পদ্ধতি।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে, এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের একদল বিদেশী পৃষ্ঠপোষকের দৌরাত্ম্যে। এরা নিজ নিজ দেশে কেউই প্রধান বা শ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্ব না হলে কি হবে, এই চমকের নাট্যধারার অন্যতম প্রবক্তার ভূমিকাটি পেয়ে গেছেন। এবং যেহেতু সব কিছুকে অস্বীকার করাই এর প্রধান চরিত্র তাই, প্রচলিত নাট্যরীতির পাঠ গ্রহণ না করেই এরা এখনো এদেশে বা দুর্লভ নয় সেই লোকভঙ্গিগুলোর প্রতি হাত বাড়িয়েছেন। ইতি-মধ্যে সেই সমস্ত ভঙ্গির যথেচ্ছ ব্যবহার প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আঞ্চলিক স্তরে এই সমস্যার চেহারাটা যথেষ্ট ভয়াবহ নয় বলেই বৃহত্তর

পরিস্থিতে, এর প্রতিপত্তি দেখে রীতিমতো বিপন্ন বোধ করি। সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মানসে যাত্রিক নিজকই একটি ছোট্ট দলকে কেন্দ্র করে চলা কিছু কাজ, সেই কর্ম-উদ্যমকে প্রসারিত করি। ফলে বিরোধ বাধে।

প্রথম বিরোধটা দেখা দেয় আমরা যে রীতি এবং নীতি অনুসরন করি তা নিয়ে। তবে প্রধান প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় মাধ্যম হিসেবে নাটকের সামাজিক ভূমিকাটি কি তা নিয়ে। আধুনিক অপরাপর গণমাধ্যমের মতোই এই চমকের নাট্যধারার ব্যক্তিত্বরা নিদান হাঁকেন, নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রচার। এবং তার একমাত্র প্রয়োগক্ষেত্র গ্রামাঞ্চল। স্পষ্টতই এই ভাবধারার সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয়। নাটক যা নয়, নাটককে তাতে রূপান্তরিত করার এই চমকপ্রদ উদ্যোগগুলোকে প্রতিহত করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

অনেকটা সেই প্রয়োজনবোধ থেকেও এই গ্রন্থের পরিকল্পনা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ জরুরী যে—আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে, পুরোনো রীতির নাট্যধারার মতো সমস্ত কিছুকে মঞ্চের ওপরই উদ্ঘাটিত হতে হবে—এমন বদ্ধমূল বিশ্বাসও আমার নেই। বরং আমার ধারণা নাটকে ঘটনা চরিত্ররা এমনভাবে মঞ্চে আসবে যাতে দর্শক বুঝতে পারেন যে যা দেখানো হলো তার বাইরে অনেক কিছুই দেখানোর ছিল। মূল প্রতিপাদ্যের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তারা দেখছেন।

এই মঞ্চের বাইরেও নাট্যসত্তার অস্তিত্ব, আমার বিশ্বাস, মিশ্ররীতিই সে ব্যাপারে সর্বাধিক স্বাধীনতা দিতে পারে।

গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য উইলিয়াম কেরী স্টাডি অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর মহোদয় অধ্যাপক সরলকুমার চট্টোপাধ্যায় যে সার্বিক সহায়তা করেছেন সেটি আমার কাছে একটি দুর্লভ প্রাপ্তি।

প্রায় চারটি নাটক লেখার পর আমি কোরাস-৮১ দলের নাট্যকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্ভাব্য গ্রহণ-বর্জন নিয়ে আলোচনা করেছি। মহলা চলাকালীনও কিছু কিছু যোগ বিয়োগ করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুজ প্রতিম শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপল্লু ঘোষ বহুক্ষেত্রেই মুখ্য সহায়ক হয়েছেন। অতুগৃহজাত নাটকটির প্রথম খসড়া পাঠের পর, শ্রীঘোষই কখনো আমি নাটকটির যে পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম তার অনুপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ফলে ফিরে আমাকে নাটকটি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

এরা ছাড়া শ্রীমান হীরক ঘোষ, শ্রীমান স্বপন কর, শ্রীমান ঋষি দুবে এবং কল্যাণীয়া ডালিয়া বসুর মতামতকেও আমি কোথাও কোথাও গুরুত্ব দিয়েছি। রক্তনায়ক উৎসব নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরী করে স্নেহভাজন শ্রীতপন কর বিশেষ উপকার করেছেন আমার। যেহেতু এই নাটকগুলিতে সংগীতের ভূমিকা বিস্তৃত, তাই কোরাসের সংগীত শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীঅরুণ পালের সহযোগিতার কথা এখানে স্মরণ করতেই হয়।

কোরাস-৮২-র বাইরে গত প্রায় একদশক যে মানুষটির কাছ থেকে সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে আমি অপ্রত্যাশিত প্রশংসা পেয়েছি তিনি হলেন শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অবশ্যই নাট্যচিন্তা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরথীন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শুক্লা চক্রবর্তীর নিরন্তর উৎসাহ ভিন্ন এ কাজে অগ্রসর হওয়ার আমার সাহস ছিল না। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক শ্রীতড়িৎ চৌধুরী প্রচ্ছদটি এঁকে দিয়ে এই সংকলনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সবশেষে ধন্যবাদ জানাতে হয় লোকমত প্রেসের কর্মীদের। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মধ্যেও তাঁরা সময় মতো এটি মুদ্রিত করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বিনীত—

শ্রীরঞ্জিত রায়চৌধুরী

প্রথম রজনী

গ্রন্থে স্থান পাওয়া নাটকগুলির প্রথম অভিনয় দিবসের বিবরণ

রঙ্গনায়ক উৎসব

নাটক/গীতরচনা/পোষাক পরিকল্পনা—রঞ্জিত রায়চৌধুরী

সুর—অমর রায়

নির্দেশনা—শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজনা—কোরাস-৮১

প্রথম অভিনয়স্থল : ডাডসন মেমোরিয়াল হল, ব্যাঙ্গালোর।

জুন—১৯৮৬

ভূমিকালিপি :

রঙ্গনায়ক—পল্টু ঘোষ

যুবক—বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

ঘাসওয়ালা—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কাপড়ওয়ালা—শংকর দে

পুরোহিত ও আড়কাঠি—স্বপন কর

কাঠ-ব্যবসায়ী—ঋষি দুবে

রাজ প্রতিনিধি—হীরক ঘোষ

গোপাল—বাসুদেব মিত্র

দয়া/রূপাম্বরা—ডালিয়া বসু

বাচালগণ—অমর রায়, তপন কর, অরুণ পাল

তামাশা

নাটক—রঞ্জিত রায়চৌধুরী

নির্দেশনা—পলু ঘোষ

প্রথম অভিনয় স্থান—১৪।২ সদর স্ট্রীট

দিন—১৯৮২

ভূমিকালিপি :

১ম ব্যক্তি—ঋষি দুবে

২য় ব্যক্তি—দীপক রায়

দর্শক—অহিভূষণ চক্রবর্তী

নায়ক—পলু ঘোষ

জতুগৃহজাত

নাটক/গীতরচনা/পোষাক পরিকল্পনা—রঞ্জিত রায়চৌধুরী

সুর—অরুণ পাল

নির্দেশনা—শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজনা—কোরাস-৮১

প্রথম অভিনয় স্থল—থিয়েটার সেন্টার

দিন—৯ই আগস্ট, ১৯৮৬

ভূমিকালিপি :

যুধিষ্ঠির—ঋষি দুবে

ভীম—সুনীলবরণ দাস

ধর্ম—তনয় চক্রবর্তী

ইন্দ্র—শান্তরূপ রায়

পোড়ামুখ—পলু ঘোষ

কুন্তী—ডালিয়া বসু

নিষাদ রমণী—দীপা ঘোষ

কবিয়ালদ্বয়—প্রবীর মিশ্র, হীরক ঘোষ

সাতগাঁয়ের সঙ্

নাটক/গীতরচনা/পোষাক পরিকল্পনা—রঞ্জিত রায়চৌধুরী

সুর—অরুণ পাল

নির্দেশনা—শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজনা—কোরাস-৮১

প্রথম অভিনয় স্থল- আশুতোষ শতবার্ষিকী হল

দিন—১৭ জুলাই, ১৯৮৭

ভূমিকালিপি :

হারাধন—ঋষি দুবে/পলু ঘোষ

পদ্ম—ডালিয়া বসু

দুর্যোধন ও শিবু—তুষার রায়

নিধিরাম ও মধু—সুনীলবরণ দাস

কোন একব্যক্তি—স্বপন কর

পান্না সাপুই—বুলু ঘোষ/শঙ্কর দত্তগুপ্ত

খগেন ও ভুজঙ্গ—তনয় চক্রবর্তী

ছিদাম—জয়দীপ ব্যানার্জী/প্রবীর মিশ্র

লোকটি, গ্রামসেবক, বাবু ও মুখোশ—হীরক ঘোষ

সুজন পাল—পলু ঘোষ, সৌরেন লাহিড়ী

সঙের নাচের দল—প্রীতম বসু, অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা মান্না, দুর্গা চৌধুরী, কেয়া চক্রবর্তী

গানের দল—অরুণ পাল, সুপ্রা দত্ত, মিন্নু সাহা, আলপনা ঘোষ, প্রীতিকণা দাস, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, বরুণ ব্যানার্জী, মমতা কুণ্ডু, দীপক কুণ্ডু, তপন কর

সূচীপত্র

রঙ্গনায়ক উৎসব

: চরিত্রলিপি :

রঙ্গনায়ক / দয়াময়ী / রূপাম্বরা / যুবক / ব্যবসায়ী / বন্ধু / পুরোহিত/ রাজ-অনুচর / গোপাল / ঘাসওয়ালা/ ব্যাধ/ কাপড়ওয়ালা/দুই বাচাল।

নানা সাজ পোশাকে সাজা মানুষজনেদের দৃশ্যে বার বার আসা যাওয়া করতে দেখা যায়। এক কোনে কয়েকটি গোটানো ফেস্টুন।

[নেপথ্যে মাইকে ঘোষণা হয়]

মাইক ॥ বন্ধুগণ, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, [এইমাত্র উত্তর ভারত থেকে আরো দুটি দল এসে পৌঁছেছে। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল, বাংলাদেশের দলটিও আগতপ্রায়।

(এই সময় দুজন লোক একটি ফেস্টুন খুলে লেখা পড়তে চেষ্টা করবে)

ফেস্টুনে লেখা :—"রজনায়ক উৎসব"

(লোক দুটো চলে যাবে)

মাইক ॥ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের বলছি, আপনারা আস্তে আস্তে রঙ্গভূমি অতিক্রম করুন। শোভাযাত্রার শেষে যুদ্ধনৃত্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের আরম্ভ।

[শোভাযাত্রা যায়। সব শেষে ছৌনাচের শিল্পী মুখোশ-পরা অবস্থায় ঢোকে। নাচ চলতে থাকে। শিল্পী একসময় মুখোশ খুলে এগিয়ে আসে।]

শিল্পী ॥ আসলে এটা যুদ্ধের নাচ নয়, এটা হলো বাঁচার লড়াই-এর মহড়া মাত্র। মানে আমরা এই সিধে সোজা হাবাগোবা গরীব মানুষেরা যাতে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারি তার মহড়া। যাতে আমাদের ঘরে ঘরে আবার নবান্নের ধান ওঠে, যাতে সংসারগুলোতে বাধা থাকে সুখ। সাঁঝের বেলায় ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলবে, আমাদের মালোপাড়ার মাছ-ধারার ভরা কোটালেও যাতে সমুদ্রে যেতে পারে—একি খুব বেশী চাওয়া? কুমোরপাড়ায় বন বন চাকা ঘুরবে যাতে ভাত রাঁধার হাড়িতে টান না পড়ে, কামারশালে তৈরী হবে কাস্তে লাঙল। দিনভর তাঁতঘরগুলোতে ছটফট্ করবে মাকু, আমাদের ধোপা পড়ার পাটে রোজ আঁচার পরবে আর নরসুন্দর দাদারা মুখখানা সাফ করে দেবে একেবারে রাজপুত্রের মতো। আমাদের বীজতলাগুলো ছাপিয়ে যাবে চারায়, মাটি খুঁড়লেই মিলবে ঠাণ্ডা শীতল পানীয় জল। আমাদের গাইগুলো গর্ভবতী হবে,

আবার যেমেরা হবে এয়োতি, তারা খোকাখুকু নিয়ে তগমগ করবে আনন্দে। এইতো, এ কখনও যুদ্ধ হয়। এ হলো বাঁচার বিত্তান্ত।

(আস্তে আস্তে চলে যাবে)

[দৃশ্যে দুজন বাচাল ঢুকবে তারা গান ধরবে]

মোরা বাঁচার তরে যা করি গো, তা তো যুদ্ধ নয়

ঘর গৃহস্থি যুদ্ধ যদি শান্তি কারে কয়।

যুদ্ধ করে রাজার রাজায়, মোদের শুধু প্রাণটুকু যায়।

সেই প্রাণের মায়া আছে তাই যুদ্ধে মোদের ভয়।

রাজার রাজা ছিলেন যেজন—

সর্বলোকের পরাণের ধন, রঙ্গনায়ক নামটি যে তার

শুনুন তার কি পরিচয়, মোরা বাঁচার তরে যা করি সে তো যুদ্ধ নয়॥

(বাচাল দুজন দৃশ্যের বাইরে চলে যাবে।)

মাইক॥ এবার শুরু হচ্ছে নাটক—রঙ্গনায়ক উৎসব—যে মহান চরিত্রের স্মরণ উৎসবে আমরা এখানে প্রতিবছরের মতো আজো মিলিত হয়েছি, আমরা যারা সংস্কৃতি-কর্মী, আসুন মনেপ্রাণে। আশা করি তার জীবন কাহিনী আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

রঙ্গনায়ক॥ রাজ আজ্ঞা তাই যেতে হবে! এ বড় আশ্চর্য দাবী! আমার কর্তব্যকর্ম রাজদ্বারে হয়ে গেল স্থির! রঙ্গভূমি হতে রণাঙ্গন—এত যদি শ্রেয়, তবে কেন লোকে শিক্ষা করে, নানা শাস্ত্র নৃত্য নাট্যকলা? কেন তবে আনন্দ উৎসবে—লোক-সম্বর্ধনা পায় নটনটীগণ! সে কি শুধু প্রথা মাত্র সার? আমি রঙ্গকর্মী, রঙ্গভূমি আমার পৃথিবী।

[রূপাম্বরার প্রবেশ]

রূপাম্বরা॥ রঙ্গদেব।

নায়ক॥ রূপাম্বরা, তুমি অসময়ে।

রূপাম্বরা॥ সু-সময় চলে গেছে কবে। এখন যতদূর দেখি, দুঃসময়, বড় দুর্দিন।

নায়ক॥ তবু হেন অসময়ে আমারে পড়েছে মনে, সৌভাগ্য আমার রূপাম্বরা।

রূপাম্বরা॥ চতুর্দিকে ফেরে যত রাজ অনুচর, জেনেছি তাদেরই কাছে শবরপল্লীর পথে নির্দিষ্ট হয়েছে আনাগোনা।

নায়ক॥ (রহস্য করে) নারী সঙ্গে ভুলেছে কর্তব্যকর্ম রাজকর্মচারী! সুতনুকা, গোপন তথ্যের হেন উন্মোচন যুদ্ধকালে অভিপ্রেত নহে।

রূপাম্বরা ॥ পরিহাস রাখো রঙ্গদেব—বলো দেব, শবরপল্লীর পথে কেন ফেরে রাজ-অনুচর ?

নায়ক ॥ রঙ্গকর্মীর খোঁজে।

নারী ॥ রহস্য রাখো, বলো কোন অভিপ্রায়ে নিয়ত চলেছে তারা ?

নায়ক ॥ ভাগ্যাহত আমি ছাড়া এখন শবরপল্লী যুবা কিংবা পুরুষবিহীন। রণাঙ্গনে তারা বহুকাল চলে গেছে।

নারী ॥ তবে লক্ষ্য তুমি ? রণক্ষেত্রে তোমাকেও পাঠাতে প্রস্তুত !

নায়ক ॥ অনুমান সত্য তব নারী। শুধু যোদ্ধা বেশে নয়, রণাঙ্গন হতে দূরে যেতে হবে শত্রুর শিবিরে, অভিনেতা রূপে, গুপ্তচর হয়ে।

নারী ॥ বহু আগেই সেই নির্দেশ গিয়েছে জুটে হতভাগিনীর।

নায়ক ॥ যুদ্ধের স্বভাব এই ! সে কখনও রাখে না তফাৎ। সকলের প্রতি তার সম-কৃপাদৃষ্টি।

নারী ॥ রাজদ্বারে স্থির হয়ে যাবে আমাদের ভাগ্য ভবিষ্যৎ ?

নায়ক ॥ প্রচলিত এইতো নিয়ম।

নারী ॥ জানি, তবু রাজ অনুগ্রহে আর নেই অভিরুচি।

নায়ক ॥ স্তব্ধ হও রূপ ! জানো নাকি ছায়াসম ফেরে রাজ অনুচর ?

নারী ॥ তথাপি !

নায়ক ॥ রূপাম্বরা, যুদ্ধ বড় ক্রূর বাস্তবতা। রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট যে জীবন তোমার আমার, সে জীবনে এ সমস্তই মূর্খ বাচালতা।

নারী ॥ শত্রু শিবিরে নিজ দেহ কিম্বা প্রাণ বিসর্জনে, বিশ্বাস করি না হবে কোন পুণ্যার্জন।

নায়ক ॥ প্রশ্ন পুণ্যের নয় রূপ, প্রশ্ন কিভাবে নির্বাহ হবে জীবন তোমার !

নারী ॥ আমি নারী পশারিণী, দক্ষ নাগরিকা। রূপের পশরা লয়ে অনেক করেছি খেলা, অনেক করেছি বিদ্ধ মোহ দৃষ্টিপাতে। পরিচিত সেই সব খেলা ফেলে চলে যাবো নগর সীমান্ত ছাড়ি দূরে, গ্রাম দেশে। এখন আপাতকাল গ্রামদেশে বড় বেশী নিরাপদ।

নায়ক ॥ আপন কর্তব্য তবে স্থির হয়ে গেছে। সাহস যদিও আছে অনুরূপ, তবু সুযোগ আপাতত কোথাও দেখিনা। রঙ্গভূমে কর্মসূত্রে সর্বজনে পরিচিত আমি, অসংখ্য দৃষ্টির মাঝে বলো রূপ কোথায় লুকাবো ? দীপালোকে, আধো ছায়া আধো আলো মাঝে—দেহলোভী মানুষেরা

যারা আসে যায়, তাদের স্মৃতিতে তুমি মূর্তিমতী সন্তোষ প্রতিমা। তারা ফিরে গেলে, তোমাকে রাখে মনে বড় জোর দণ্ড দুইচারি, কিন্তু আমি! অসংখ্য দৃষ্টির মাঝে চিরকাল বন্দী হয়ে থাকি।

নারী ॥ দেব, তবে আশীর্বাদ করো।

নায়ক ॥ হায়রে অবুঝ নারী, আজন্ম বন্দীর কাছে প্রত্যাশা করেছো আশীর্বাদ।

নারী ॥ এ শুধু শুভেচ্ছা নয় রঙ্গদেব। এই সেই মানসী কল্পনা, যে মোহ রহস্য তারে ঘিরে থাকে সমস্ত সময়, যে অঙ্গ আসঙ্গ নিয়ে গড়া তার মোহিনী শরীর, তারই মাঝে আছে এক নীরব পূজারী, এ তার গোপন অঞ্জলি।

নায়ক ॥ শুভময় হোক, তব যাত্রা পথ।

নারী ॥ রঙ্গদেব।

নায়ক ॥ জানি তোমার নীরব প্রশ্ন এই বন্দীকে ঘিরে। শবর পল্লী থেকে— আজ এইক্ষণে যদি কোথাও চলে যাই সমগ্র অঞ্চল তবে উপদ্রুত হবে। জানো নাকি দিবালোকে যতই অস্পৃশ্য হোক শবর যুবতী, দীপালোকে সে সকলের কামনার ধন। শবর শিশুরে নিতে কিনে দাস ব্যবসায় দক্ষ দানবেরা নিত্যদিন ফেরে। যে মাটি দিয়েছে এত স্নেহ ভালবাসা,—যে পল্লীর প্রতিটি প্রাণ জন্মাবধি দিয়েছে আশ্রয়, সেই পরম প্রিয় ধন ফেলে কোথায় পালাবো?

নারী ॥ তবে যাই।

নায়ক ॥ দেখা হবে।

নারী ॥ মনে রেখো ......

নায়ক ॥ যতদূর যাবে তুমি সারাক্ষণ মনে রেখো, তুমি কোন বন্দী মানুষের প্রতিনিধি। মনে রেখো—তোমার ভিতর দিয়ে দেখে নিতে হবে তাকে—কিভাবে আপন স্বদেশ যুদ্ধ করে বাঁচে। দেখা হবে—

[রূপাম্বরা চলে যায়, আলো কমে আসে]

[দৃশ্যে আলো ক্রমশ জোরালো হয়, তাতে দেখা যায়—, উদভ্রান্তের মতো এক যুবক ক্রমশ এগোচ্ছে।]

যুবক ॥ দেখা হবে, এই সেই গোপন মন্ত্র যা আওড়াতে আওড়াতে এতটুকু ভাবনা চিন্তা না করে আমরা যুদ্ধে চলে যাই। কেবলই আশা করি, আবার ফিরে আসবো, আবার সবার সঙ্গে দেখা হবে,—সে বলেছিলো,

—বলেছিলো দেখো, আবার ঠিক দেখা হবে। চিরকাল তো যুদ্ধ থাকে না, আমি ঠিক তোমার সন্তানকে রক্ষা করবো। রণাঙ্গন থেকে ফিরে, আমি তাকে তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পাইনি. কোথাও নেই সেই হতভাগ্য নারী, অনাগত শিশুর দুঃখিনী জননী। তবু কি আশ্চর্য দেখুন, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি আবার আমাদের দেখা হবে, আমার রক্ত মাংসের প্রতিনিধি সেই শিশু—[আড়কাঠি যদুরামের প্রবেশ]

যদু ॥ চুপ্। একেবারে শব্দ করবে না, শিশু শিশু করছো যে বড়।

যুবক ॥ কে তুমি?

যদুরাম ॥ আস্তে। জানো খবরটা পাঁচকান হতে পারে।

যুবক ॥ কি বলছো তুমি!

যদুরাম ॥ ঐ যে বললে না শিশু। তা কোথায় শিশু! ভয় নেই, আমায় বিশ্বাস করতে পারো।

যুবক ॥ হেঁয়ালী রাখো, বলো কি চাই।

যদু ॥ প্যাঁচ কষছো ভায়া! আরে শিকারী বিড়ালের গোঁফ বলে কথা, ঠিক চিনেছি শিশু।

যুবক ॥ বেশ শিশু, তা কি হোল?

যদু ॥ না মানে এমন যুদ্ধে শিশুদের আর কে খবর রাখে, তাই তো চলে এলাম যদি তাদের বাঁচাতে পারি।

যুবক ॥ শিশুদের বাঁচাবে! তুমি কি বৈদ্য?

যদু ॥ বললাম তো ভায়া আমি সাফ কথার মানুষ, চালাকি জানি না। বুঝতেই পারছো মস্ত মস্ত সব ভূমিপালদের সঙ্গে কাজ কারবার। তাদের সঙ্গে চালাকি চলে না।

যুবক ॥ ভূমিপাল আসছে কোথা থেকে!

যদু ॥ আসছে, আসবেই তো, এমন দুঃসময়ে শিশুদের আশ্রয় কেবল ভূমি পালেরাই দিতে পারেন। বলি, তা না হলে যুদ্ধ যেভাবে চলছে, তাতে শিশুদের কোন ভবিষ্যত আছে বলতে চাও।

যুবক ॥ তার অর্থ!

যদু ॥ পরিষ্কার। যুদ্ধে ঐ সব শিশুদের বাপ দাদারা গেছে, তারা মরবে না?

যুবক ॥ না মরতেও পারে।

যদু ॥ আরে যুদ্ধ মানেই মৃত্যু।

যুবক ॥ তা ঠিক! তবু কেউ কেউ নিশ্চয়ই বেঁচে ফেরে।

যদু ॥ ফিরবে! হয়তো ফিরবে, কিন্তু [হঠাৎ যুবকের একখানা হাত নেই দেখে] তুমি, তুমি কে?

যুবক ॥ ভয় পেলে তো! আমি কিশোর।

যদু ॥ তোমার হাতখানা……

যুবক ॥ বাঘের পেটে গেছে আর কি!

যদু ॥ বাঘ! তা জব্বর বলেছো। বাঘ শিয়াল শকুনের তো মচ্ছব এখন।

যুবক ॥ তুমি কি কোন অনাথ আশ্রমের লোক?

যদু ॥ বলতে পারো, ধরো আমার যে মালিক ভূমিপাল কৃপাবর্মা, তাঁর জমিজিরেত দেখাশোনা করে পঞ্চাশজন ভাতুয়া আর পঞ্চাশজন বেগার। বলতে গেলে কৃপাবর্মের দৌলতেই অপ-দেবতাগুলো বেঁচে আছে।

যুবক ॥ তার সাথে শিশুর সম্পর্ক কি?

যদু ॥ খুব গভীর। মানে, তুমি যদি ধরো গোটা পনের শহর শিশু যোগাড় করে দিতে পারো,—আমি ঠকাবো না, লোকে যতই আড়কাটি বলুক। বিচার করলে আমি মানুষের ভালোই করি।

যুবক ॥ দরিদ্র পল্লী থেকে শিশু কিনে চালান দেবে! যাতে তারা জমির মালিকের জমিতে বেগার খাটতে বাধ্য হয়?

যদু ॥ তাহলে এসব বিলক্ষণ জানা আছে, তাতেই ভালো। আনাড়ি হলেই বিপদ। তাহলে ঐ কথাই রইল, পনেরটা……।

যুবক ॥ দূর হও জানোয়ার। যাও। না হলে—

যদু ॥ আরে কি হলো, আরে ভাই। [যদুরামের দ্রুত প্রস্থান]

যুবক ॥ যাও, যাও নাহলে, হয়তো ঐ ভাবেই কোন আড়কাটি আমার শিশু সন্তান কে—না না অসম্ভব,—না আমাকে খুঁজে পেতেই হবে।

[যুবক চলে যাবে সামান্য সময় দৃশ্য শূন্য]

[একটু সময় পর দৃশ্যের দুদিক থেকে দুটি মাঝ বয়সের মানুষ ঢোকে। তাদের একজনের পিঠে ঘাসের বোঝা, অন্যজনের পিঠে কাপড়ের বোঝা]

ঘাস ॥ (কাপড়-কে লক্ষ্য করে) ও কর্তা, একটু হাত দাও দিকিন।

কাপড় ॥ তুমি কি জঙ্গী লোক না-কি?

ঘাস ॥ কি বলত্তি ছো, বলি চক্ষুতে দেখত্তি পাওনা?

কাপড় ।। বোকা ধরতি বললেই হয় ? তা না বলে হাত দাও। [বোকা সামাতে সাহায্য করে] হাত দিতি বললে যুদ্ধ করতে বলা হয় জানো নি ?

ঘাস ।। ঐ যুদ্ধ এবার পরানডাও নেবে।

কাপড় ।। যা বলেছো, না খেতে পেয়ে অর্দ্ধেক লোক অক্কা পাবে।

ঘাস ।। খেতে পেলেও মরতি পারে ।

কাপড় ।। অলক্ষুণে কথা বলোনি ! বরং তোমার পরিচয়টা বলো।

ঘাস ।। বিপদবরণ গোয়ালা গো ।

কাপড় ।। বিপদ। অক্ষর নাম হে তোমার। আমার বাপ আমার নাম রেখেছিলো দুঃখীরাম। দুঃখীরাম জোলা। তা বাঁচবো না বলছো কেন ?

ঘাস ।। বলছি কি আর সাধে, বলছি আমার হাড়বজ্জাৎ গাইগুলানের জন্যে।

কাপড় ।। একটু খোলসা করে বলো তো।

ঘাস ।। এত যত্ন করি। তবু শালিরা দুধ দিতে চায়না।

কাপড় ।। সে তো তবু গাই, আমার অমন জোয়ান ব্যাটা নাচতে নাচতে যুদ্ধে গেল। বুড়ো বাপ-মার জন্য কুটোগাছা পর্যন্ত পাঠায় না! শুনতে পাই মহা ফুর্তিতে আছে ! তোমার তো তবু গাই-গো।

ঘাস ।। রাজার কর্মচারীর রোজ ধমক। বলে যুদ্ধ চলতিছে, বেশী করে দুধ চাই। যত বলি, আমার শেষ বিয়েনের গাই, সে যমদূতের কেবলই ধমক—বলে তুমি ভালো ঘাস দাওনা জানোয়ার গুলানরে, আগে এসে ঘাস দেখবে, পরে দুধ নেবে। ঘাস কাটতি কাটতি মরণের দশা।

কাপড় ।। এর নাম যুদ্ধ। ভাবলাম ছেলেটা বজ্জাৎ হয়েছে হোক, এবার পাছা পেড়ে শাড়ি বুনে বেচতি যাবো। তার একখান বেচা গেলো না, বোঁচকা থেকি বের করতি মন চায় না। বেবাক গাঁয়ের বৌ-ঝি-গুলান এমন মুখ করে দেখে ভয় হয়। একটা কচি মেয়ে সবে বিধবা হয়েছে দেখে হাউমাউ করে বললে, খুড়ো সাদা থান আনতি পারলে না গো।

ঘাস ।। সব কপাল। যুদ্ধ লাগলে আমাদের মতো বুড়োদের কষ্ট, যে লড়তি গেলো, সে তো বাঁচলো। তুমি ঘরে বসে হাজার কষ্ট পাও।

কাপড় ।। যুদ্ধ অবশ্য চিরকাল চলবে না।

ঘাস ।। তা ঠিক।

কাপড় ।। তদ্দিন কাপড়গুলো তুলে রাখতি হবে।

ঘাস ॥ কিন্তু তাতে পেট চলবে কি ভাবে ?

কাপড় ॥ গরীবের মরণ।

[নেপথ্যে নারী কণ্ঠে "চাই সোহাগিনী আলতা সিন্দুর। রূপাম্বর র নতুন ছদ্মবেশ]

কাপড় ॥ ও আবার কে ?

ঘাস ॥ বলি ও ঠাকুরুন, কি বেচতি এয়েছো।

[ভিন্ন রূপসজ্জায় রূপাম্বরার প্রবেশ]

নারী ॥ সোহাগিনী আলতা সিন্দুর গো।

ঘাস ॥ আলতা সিন্দুর কেনবার লোক আছে ?

নারী ॥ এত বড় গ্রাম,—

কাপড় ॥ মাপেই বড়ো, মানুষজনে নয়।

নারী ॥ কেন, এমন কেন ?

ঘাস ॥ দেশে যুদ্ধ চলছে জানো না ?

নারী ॥ জানি বলেই তো এসেছি।

কাপড় ॥ যুদ্ধে তো আর গাঁয়ের জোয়ান মরদগুলো বেঁচে ফিরবে না।

ঘাস ॥ যুদ্ধ মানেই হলো গাঁ উজাড় করা।

নারী ॥ তা হলে! আমি তাহলে কি করবো।

কাপড় ॥ ভালো মানুষের মেয়ে, আমার যেমন পাছা পেড়ে শাড়ি বেচার উপায় নেই, তোমারও তেমনি।

নারী ॥ এ কোথায় এলাম আমি।

ঘাস ॥ যুদ্ধের সময় সব উল্টো। যুদ্ধ যেমন ভয়ংকর তার ব্যবসাও তেমনি ভীষণ হয়। তাই বলতে ছিলাম কি—

নারী ॥ এখন আমি কি করি ?

ঘাস ॥ তাই বলছিলাম কি, দিনকাল ভালো নয়। তুমি আবার ডাঁটো দেখতে, সাবধানে থেকো গো ঠাকুরুন।

নারী ॥ কিন্তু কিভাবে ?

কাপড় ॥ ঘরে বসে থাকবে, সাবধানে বের হবে এই আর কি।

নারী ॥ কিন্তু আমি যে আমার ঘর ছেড়ে এসেছি [কান্না]

ঘাস ॥ এই দেখো, মেয়েছেলের নরম মন, ঘর ছাড়তি নেই গো, মেয়ে। এখন যুদ্ধ চলতিছে, মা মেয়েরা ঘর সামলাবে। তবে না ছেলেগুলো লড়বে।

নারী ॥ আমি যে কারো মা বা মেয়ে নই।

কাপড় ॥ সে কখনও হয়! যখন জন্মেছো তখন কারো মেয়ে নিশ্চয় কারো মা-ও হতি হবে। এইতো জীবনের নিয়ম।

নারী ॥ এত ঘোর যুদ্ধে মানুষ বিশ্বাস রাখতে জানে, রুদ্রদেব, রুদ্রদেব, এরা মানুষ না দেবতা? রুদ্রদেব। (চলে যায় রূপাম্বরা)

[রূপাম্বরার ভাবান্তরে ওরা দুজন বেদনায় চুপ হয়ে থাকে কিছু সময়। দৃশ্যে একজন ব্যবসায়ী প্রবেশ করে, তাকে দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে চাউনি বিনিময় করে]

ব্যবসায়ী ॥ যাক দু-টো জ্যান্ত মানুষ পাওয়া গেল। মনে হচ্ছিল বুঝি ভূত দেখছি।

কাপড় ॥ তা যুদ্ধ যে ভাবে চলছে, ভূতেদের বড় সুদিন চলবে এবারে।

ব্যবসায়ী ॥ বাঃ বাঃ! খাসা বলেছো, তাহলেই বোঝ, যুদ্ধ মানেই হোল ভূতেদের জয়জয়কার। কি, তাই না?

ঘাস ॥ যা বলেছো কর্ত্তা।

ব্যবসায়ী ॥ অথচ ধরো, আমরা যদি একটু মাথা খাটাই তাহলে আমরা নিজের গাঁয়ে ভূতেদের ঢুকতে না দিতে পারি।

কাপড় ॥ কি বলতি চাও আপনি।

ব্যবসায়ী ॥ সোজা কথা। বলি ভূতেদের বসবাস কোথায় বলো?

ঘাস ॥ এ আবার কেমন পরিক্ষে!

ব্যবসায়ী ॥ পরিক্ষে নয়। এ হলো সোজা হিসেব! ভূতেরা থাকে গাছে, মানে গাছের আগডালে মগডালে, কি থাকে তো?

ঘাস ॥ তাই তো শুনি।

ব্যবসায়ী ॥ শুনি মানে, তুমি কখনও ভূত দেখনি?

ঘাস ॥ না, মানে বুঝলে .... ।

ব্যবসায়ী ॥ কি ভয়ানক! তুমি তো ঘোর অনাচারি, এতো ভালোকথা নয়।

[নেপথ্যে গলাশোনা যাবে, ওঁ যমালয়ে সকলং গচ্ছ! ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি]

কাপড় ॥ পুরুতঠাকুরের গলা!

ব্যবসায়ী ॥ পুরুতঠাকুর, একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। [ব্যস্ত ভাবে]

ঠাকুর মশায়, ও ঠাকুর মশাই।

[দৃশ্যে পুরুত ঢুকবে]

পুরুত ॥ কল্যাণ হোক, এত গোল কিসের ?

ব্যবসায়ী ॥ অপরাধ নেবেন না প্রভু। প্রভু, ঐ লোকটি বলছিলো যে জীবনে ভূত দেখেনি।

পুরুত ॥ ভূত দেখেনি ? ঘোর কলি! তুমি কি বিধর্মী নাকি হে ?

দাস ॥ না মানে বয়স হয়েছে তো... ।

পুরুত ॥ অথচ ধর্মে মতি নেই! কি ভয়ানক! তোমার প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া উদ্ধার নেই। নাহলে ঘোর অকল্যাণ হবে গ্রামের।

ব্যবসায়ী ॥ আমি সেই কথাই বলছিলাম। বলছিলাম, আমরা চেষ্টা করলে গ্রামগুলোকে ভূতের উৎপাত থেকে রক্ষা করতে পারি।

পুরুত ॥ মহৎ উদ্দেশ্য! বলো, শুনি কি অভিপ্রায়!

ব্যবসায়ী ॥ যুদ্ধ যখন চলছে তখন হাজার হাজার লোক মরবে।

পুরুত ॥ পাপের বেতন মৃত্যু।

ব্যবসায়ী ॥ প্রভুর অপার করুণা। এখন সেই মৃত মানুষগুলোর অতৃপ্ত আত্মারা বাতাসে ভর করে ঘুরে বেড়াবে।

পুরুত ॥ সেই জন্যই শাস্ত্রে পিণ্ডদানের নির্দেশ আছে।

ব্যবসায়ী ॥ আপনি সাক্ষাৎ দেবতা। প্রভু, সেবকের এই অর্থ গ্রহণ করুন।

[লুকিয়ে উৎকোচ দেয়]

পুরুত ॥ তুমি যথার্থই ধার্মিক।

ব্যবসায়ী ॥ সবই প্রভুর কৃপা। তা যা বলছিলাম, আমরা একমত হলে সেইসব দুরাত্মাদের ঠেকাতে পারি।

পুরুত ॥ যথা।

ব্যবসায়ী ॥ যথা, আমি এ অঞ্চলের সব গাছগুলো কেনার কথা বলছি।

পুরুত ॥ গাছ! মানে বৃক্ষ ?

ব্যবসায়ী ॥ মৃত সৎকারের জন্য কাঠের প্রয়োজন আছে। তাই আমার পরিকল্পনা, সামান্য মূল্যে গাছ কিনে, শবদাহের জন্য কাঠ প্রস্তুত রাখা।

পুরুত ॥ বাঃ তুমি তো মহান ব্যক্তি হে! ঐ সঙ্গে যদি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাটাও করতে পারো—

ব্যবসায়ী ॥ সৎকার মানেই পিণ্ডদান প্রভু।

পুরুত ॥ তোমার মধ্যে আমি নারায়ণ প্রত্যক্ষ করছি।

ব্যবসায়ী ॥ সবই আপনার কৃপা প্রভু। যেহেতু বার্ধটা গ্রামের তাই গাছগুলো

বিনামূল্যে পাওয়া উচিৎ। তবু আমি মূল্য দিতে প্রস্তুত।

পুরোহিত আহা, বিপদকালেই প্রকৃত ধার্মিকের দেখা পাওয়া যায়। এই

বেটা বুড়োর দল, ওকে সাহায্য কর নইলে ঘোর অকল্যাণ হবে।

ব্যবসায়ী ॥ আমিতো সেই কথাই বলছিলাম। সব গাছ কিনে চেরাই করে

কাঠ প্রস্তুত রাখা, যাতে প্রত্যেকে বিপদের সময় কাঠ পায়।

দাস ॥ আমার যে আলশেওড়া ছাড়া কোন গাছ নেই।

কাশু ॥ আমার চারটে শুধু তাল গাছ আছে।

পুরোহিত তাই দিবি, তাই দিয়ে দে।

ব্যবসায়ী ॥ কি, রাজী ?

পুরোহিত ॥ রাজীর কি আছে। ধর্মের ব্যাপার ওরা না বলার কে ? গাছ

ওদের দিতেই হবে। তুমি শুধু পিণ্ডদানের ব্যাপারটা একটু দেখো।

ওং যমালয়ে সকলং গচ্ছ। [পুরোহিতের প্রস্থান]

ব্যবসায়ী ॥ [স্বগত] তারপর সমস্ত গাছগুলো একবার বাগাতে পারলে তখন

ভূতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সবাই দ্বিগুণ দাম দিয়ে কাঠ কিনবে।

[প্রকাশ্যে] চলো হে। তোমাদের শেওড়া আর তালগাছগুলো দিয়েই

আরম্ভ করা যাক।

[আলো কমে আসে। [ ] জন বাচালের প্রবেশ। দৃশ্যে দূরে এককোণে

রূপান্বিত যুবক ও রঙ্গনায়ক বসে আছে। বাচালেরা গান ধরে

বিপদকালে পড়ে মোদের মনে

তা না হলে ভুলে থাকো, থাকো সুখের সিংহাসনে

বিপদকালে পড়ে মোদের মনে।

তখন তুমি সবার রাজা

দিতে কুশল শাসন সাজা

চলাফেরা যতেক কর্ম, শুধু পাত্র মিত্র সনে

বিপদকালে পড়ে মোদের মনে ॥

তাইতো বলি রাজামশাই

এবার মোদের ঠিক জানা চাই

প্রাণ-ও দেবো মান-ও দেবো

মোরা তার কি কারণে
বিপদকালে পড়ে মোদের মনে ।

[গান শেষ হওয়ার মুখে অনুচরের প্রবেশ গান থামলে]

অনুচর ॥ (হাততালি দেবে) সাবাস, চমৎকার !

১ম গাইয়ে ॥ গান ভালো লেগেছে ?

অনুচর ॥ বিলক্ষণ । (ভাবান্তর) জানো, এখন রাজ্যে যুদ্ধ চলছে !

২য় গাইয়ে ॥ সে আর জানি নে, খুব জানি ।

অনুচর ॥ তাহলে এসব গান গাইছো যে বড় ?

২য় ॥ গান গাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ জানি নে গো ।

অনুচর ॥ এ গান, না রাজদ্রোহ ?

১ম ও ২য় ॥ (বিপদ বুঝে) আমরা বাচাল গো মশায় ।

অনুচর ॥ বাচাল ? বেশ রাজসভায় তার বিচার হবে । এখন দেখছি খবরটা যথার্থ যে, দেশের মধ্যেই শত্রুর চর আছে ।

১ম ॥ তুমি যদি চাও আমরা একটা যুদ্ধ বন্দনা গাইতে পারি ।

২য় ॥ গাইবো ?

অনুচর ॥ রসিকতা রাখো, প্রকাশ্য দিনের আলোয় তোমরা মানুষ খ্যাপানোর গান গাও । ভেবেছো রাজ্যে রাজার অনুগত লোকের অভাব ।

(হঠাৎ পেছনে রঙ্গনায়ক, যুবক ও রূপাম্বরাকে দেখে)

একি ! মহানায়ক ! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন ! আপনারা ?

নায়ক ॥ ঐ বাচালদের সঙ্গীত শুনছিলাম ।

অনুচর ॥ মহানায়ক ! আপনি একে সঙ্গীত বলেন ।

নারী ॥ নিষ্পাপ সঙ্গীত ।

অনুচর ॥ কিন্তু গানের কথার মধ্যে যে জঘন্য দেশ-দ্রোহিতামূলক ইঙ্গিত আছে !

নায়ক ॥ ওরা বাচাল । যুদ্ধের সময় মানুষ যখন মরমে মরে আছে তখন ওরাই মানুষকে আনন্দ দিতে চাইছে । এতে অন্যায় কোথায় রাজপ্রতিনিধি ?

অনুচর ॥ ওঃ ! আমার বিশ্বাস ছিলো, আপনি আপনার কর্তব্য ভালোভাবে জানেন ।

নায়ক ॥ আমারও তাই বিশ্বাস ।

অনুচর ॥ তাহলে ! তাহলে ঐ জঘন্য প্ররোচনামূলক গানের কথা আপনি রাজদ্বারে জানালেন না কেন মহানায়ক ?

নায়ক ॥ অনুচর ! তোমার কাছে নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য শিখতে হবে না।

অনুচর ॥ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আপতকালে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অন্যতম কর্তব্য হলো গোপনে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। অন্তত আমি সেইরকম জানি।

নায়ক ॥ স্তব্ধ হও অনুচর। অভিনেতা গুপ্তচর নয়, অভিনেতা রূপশিল্পী।

অনুচর ॥ বৃথা তর্কে কি কাজ ! এই, তোরা আমার সঙ্গে চল।

[ওদের ধরতে চেষ্টা করে। রূপাশ্বরা বাধা দেয়]

নারী ॥ না ওরা যাবে না।

যুবক ॥ ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে তুমি যে বিপদেই ফেলবে ও কথা ওরা না জানলেও আমরা জানি।

অনুচর ॥ চল বলছি !

নায়ক ॥ অসম্ভব, যতক্ষণ দৃশ্যে আমি আছি, ততক্ষণ কোনমতে দেবোনা ওদের যেতে !

অনুচর ॥ আমার কর্তব্যকর্মে আপনি বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন ! এর পরিণাম অপ্রীতিকর হতে পারে।

নায়ক ॥ জানি। তবু এই মুহূর্তে ওদের রক্ষা করাই আমার কর্তব্য।

অনুচর ॥ বেশ। পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকবেন মহানায়ক। [চলে যাবে]

যুবক ॥ এ তুমি কি করলে মহানায়ক ! ওদের প্রতিহিংসা যে ভীষণ তুমি জানো ?

নায়ক ॥ জানি বন্ধু। ওরা আর আমায় বিশ্বাস করবে না, এখন থেকে সারাক্ষণ ছায়াসঙ্গী হয়ে ফিরবে গুপ্তচর ! এ সবই আমার জানা। তবু ! তবু বলো কিশোর, এই সব দুঃসাহসী মানুষদের আমরা যদি রক্ষা না করি, তাহলে দেশ যে শুধু ক্লীব আর অনাথে ভরে যাবে !

নারী ॥ ওদের সম্বর্ধনা দেওয়া উচিৎ আমাদের।

যুবক ॥ তাই ওদের মুক্ত রাখতে হবে ! তা না হলে মানুষ হয়তো জানতেই পারবেনা একটা যুদ্ধ, তা সে যে কারণেই বেধে থাকুক, যুদ্ধ মাত্রই কি ভয়ংকর !

১ম ॥ আমাদের জন্যে তোমরা বিপদ ডাকলে।

২য় ॥ তার চেয়ে রাজার বিচারই ভালো ছিলো।

নায়ক ॥ না, তা হয়না বন্ধুগণ।

নারী ॥ রুদ্রদেব, এখন আমাদের কর্তব্য কি ?

নায়ক ॥ ঠিক জানি না। তবে এ বিশ্বাস আছে, পথ একটা আমরা পেয়ে যাবোই। প্রিয় বন্ধুরা তোমরা আবার ঐ সঙ্গীত পরিবেশন করো।

১ম ॥ তাতে বিপদ বাড়বে যে।

নায়ক ॥ যুদ্ধে মৃতভিন্ন আর কেউই নিরাপদ নয়। তোমরা আরম্ভ করো।

[গান শুরু হয়] গানে থাকে প্রাণের কথা

সেই কথাকে রুখবে তুমি ?
দেশ তো নয় রাজার শুধু
মোদের সবার জন্মভূমি।
গানে থাকে প্রাণের কথা
কাছের যে জন বন্ধু তোমার
তারে তোলো শত্রু করে
ভাবছো তুমি সবাই বাতুল
মানুষ যত গ্রাম শহরে
গানে থাকে প্রাণের কথা ॥

[ওরা গান গাইতে থাকে। রূপাম্বরা, যুবক, নায়ক আবার পিছনে গিয়ে স্থির হয়ে বসে। গাইয়েদের সামনে দিয়েই হাঁফাতে হাঁফাতে গোপালের দৃশ্যে প্রবেশ।]

গোপাল ॥ না কিছুতেই না, আমি, আমি যুদ্ধে যেতে চাইনা, না। (শান্ত গলায়)

গোপাল ॥ সাধ করে কি নাম লেখাতে গেলাম! গাঁয়ে যেটুকু ভিটেমাটি ছিলো সব ঐ ভূমিপালেরা কেড়ে নিল। দুবেলা দু-মুঠো খাবার পথ নেই। জোয়ান শরীর খেতে পাইনে, মা বোনেদের লজ্জা ঢাকবার একটুকরো কাপড় দিতে পারিনি তাই ভাবলাম—যুদ্ধ করবো। যখন ওরা আমার বুকের মাপ নিচ্ছিল, তখন একজন রাজকর্মচারী হঠাৎ বলে উঠলো, আরে গোপাল না। আমি তো অবাক! সে বলল, তুমি লড়াইয়ে মৃত রাখালের বন্ধু! সেই রাখাল, যার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ের কথা পাকা। রাখাল বেঁচে নেই শুনেই আমার ভেতরটা কেমন হতে থাকলো। আমার বড় আদরের বোন দয়াময়ী। ভাবলাম যদি রাখাল না ফেরে তাহলে বোনটা আমার লগ্নভ্রষ্টা হবে, তখন আমি

যুদ্ধে! মা বাবা অসহায়, তখন সে কি করবে, ভাই! ভাই! পালিয়ে এলাম।

[এখানে নিঃশব্দে কিশোর, বুজনায়ক ও রূপাবুরা দৃশ্যে ঢুকবে। কিন্তু তারা যতক্ষণ না অনুচর গোপালকে নিয়ে যাচ্ছে—চুপচাপ থাকবে]

(অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর ॥ এই যে, ভেবেছো চোখে ধুলো দেবে।

গোপাল ॥ তোমার পায়ে পড়ি! আমি যুদ্ধে যাব না।

অনুচর ॥ আমি যুদ্ধে যাব না! কেন, গাঁয়ে থেকে মেয়ে ছেলেদের সাথে সুযোগ বুঝে ফষ্টিনষ্টি করবে।

গোপাল ॥ ছি ছি ও কথা বলবেন না—

অনুচর ॥ বেশ চল্‌,-তবে নাম লেখাবি।

গোপাল ॥ না সে হবার নয়! আমার কচি বোনটা বাগদত্তা ছিলো, ঐ রাখালের সাথে তার বিয়ে হবার কথা তা রাখাল তো নেই...!

অনুচর ॥ তাতে কি হলো?

গোপাল ॥ বোনটা যদি কোন বিপদ ঘটায়!

অনুচর ॥ মরবে? এখন যুদ্ধ চলছে. এখন তো নানা ভাবে কমানোর সময়। মরবে না মরবে না।

গোপাল ॥ না ওকে আমি চিনি।

অনুচর ॥ ফাজলামি রাখো। চলো।

গোপাল ॥ আমাকে ছেড়ে দিন।

অনুচর ॥ আব্দার আর কি! ওদিকে যারা দেখেছে তুমি ভয় পেয়ে পালিয়েছো তোমায় নিয়ে না গেলে তারা যদি ভয় পেয়ে পালায়। চলো।

গোপাল ॥ না আমি যাবো না।

অনুচর ॥ কেন শুনি?

গোপাল ॥ যুদ্ধে জিতলে সে তো রাজার জিৎ, আমার কি? উল্টে ঐ।

রাখাল ॥ এর মতো আমার প্রাণটা যেতে পারে! জিতলে আমার জমি কি ফেরৎ পাবো? যুদ্ধ থেমে গেলে আমি কি কাজ পাবো? বলো?

অনুচর ॥ তুই রাজার অপবাদ দিচ্ছিস্‌?

গোপাল ॥ না শুধু বলতে চাই, যুদ্ধে আমাদের লাভ নেই। আমাদের ভাগ্য যুদ্ধে বদলাবে না।

অনুচর ॥ চল:! চল্ বলছি।

(গোপালকে টানতে টানতে নিয়ে যায়)

যুবক ॥ কি ভীষণ এ যুদ্ধ, বজ্রদেব! বজ্রদেব! ওকে, ওকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

নায়ক ॥ না কিশোর, আর কালক্ষেপ নয়। চলো পথে প্রান্তরে নগরে বন্দরে, আমরা এই যে মানুষের উপর চাপানো যুদ্ধ এর ভয়ঙ্কর দিকটা যে কি নিদারুণ তা সবার কাছে বলব, বলব। কোন যুদ্ধেই আমাদের মতো মানুষদের লাভ নেই। বলবো।

(বাচাল দুজনের প্রবেশ/ গান গাইতে থাকে)

গানে থাকে প্রাণের কথা···

(রূপায়িতা, নায়ক চলে যায়। যুবক একপাশে শুয়ে পড়ে। সামান্য সময় নীরবতা। যুবক আধ শোওয়া অবস্থায়। বজ্রনায়ক নাট্য পরিচালকের ভঙ্গিতে ওদের দুজনকে অভিনয় আরম্ভের আগে পরামর্শ দিচ্ছেন দেখা যাবে। বজ্রনায়কের প্রস্থান)

যুবক ॥ ঐ ঐ সাবধান, সামনে শত্রু সাবধান।

(আস্তে আস্তে দয়াময়ীর প্রবেশ)

দয়া ॥ (জাগাতে চেষ্টা করে)—শুনতে পাচ্ছে।

যুবক ॥ (ব্যস্তভাবে)—কে। কে তুমি?

দয়া ॥ আমি এক হতভাগিনী দয়াময়ী।

যুবক ॥ দয়া! তুমি!

দয়া ॥ এমন শীতে তুমি এখানে পথের পাশে কেন?

যুবক ॥ এই যুদ্ধ আমাদের আশ্রয়গুলো কেড়ে নিয়েছে।

দয়া ॥ ও, তুমি সৈনিক!

যুবক ॥ বলতে পারো যুদ্ধের এঁটো।

দয়া ॥ তা হলে যুদ্ধ থেকে মানুষ বেঁচে ফেরে!

যুবক ॥ কেউ কেউ বেঁচে ফেরে বৈকি, না হলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যেতো।

দয়া ॥ তাহলে, তাহলে সে কেন ফিরলো না। (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

যুবক ॥ কার কথা বলছো ? তুমি কে ?

দয়া ॥ জানো, তার সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক, এমন কি আমার আশীর্বাদ হয়ে গিয়েছিলো। অথচ মানুষটা ফিরলো না! আমি লগ্নভ্রষ্টা হলাম।

যুবক ॥ ও তুমি সেই গোপালের বোন।

দয়া ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি আমার দাদাকে দেখেছো ? আমি তার খোঁজে এসেছি। পাছে আমি কষ্ট পাই, তাই নাকি সে রাজকর্মচারীর সাথে ঝগড়া করে পালিয়েছে। ওরা দাদাকে শেষ করে ফেলবে। আমি, আমি তাই তো খুঁজতে বের হয়েছি।

যুবক ॥ এই অসময়ে।

দয়া ॥ না আর একটা কারণ আছে।

যুবক ॥ বলো কি সেই কারণ।

দয়া ॥ একটি কোলের শিশু, আমার সই মমতা, তার সন্তান।

যুবক ॥ কি বললে, মমতা ?

দয়া ॥ মমতা।

যুবক ॥ বলো, তারপর, বলো থেমে থেকো না ?

দয়া ॥ সেই কোলের বাচ্চাটার বড় অসুখ। বেচারা মার কোল থেকে শিশুটা নামতেই চায়না, অথচ এখুনি বৈদ্য দরকার।

যুবক ॥ বৈদ্য ! চলো আমাকে পথ দেখাও।

দয়া ॥ তুমি ক্লান্ত।

যুবক ॥ না আমি ক্লান্ত নই। দয়া, তুমি জানোনা যত দুঃসময় হোক, এই গভীর রাত্রে আমাদের একজন বৈদ্য খুঁজে পেতেই হবে।

দয়া ॥ আমি খুঁজতেই বের হয়েছিলাম, তখন শুনলাম দাদাকে রাজার কর্মচারী মারতে মারতে নিয়ে গেছে। বড় ভয় হচ্ছিল। তাইতো তোমায় জাগালাম।

যুবক ॥ দয়াময়ী, তুমি সত্যিই মূর্তিমতী করুণা,—চলো।

[দৃশ্যে রঙ্গনায়ক ঢুকবে]

নায়ক ॥ আরো মর্মস্পর্শী করো, আরো করুণ হবে এই দৃশ্য। যাতে সমগ্র দর্শককুল এই কথাটা বুঝতে পারে, যুদ্ধ এক সম্মোহন। যুদ্ধ তোমার আমার মতে মানুষের আত্মহত্যার উদ্যোগ মাত্র।

শব্দা ॥ বেশ।

যুবক ॥ তাই হবে রাজবের।

(তিনজন পেছনে চলে যাবে। সামান্য সময় মঞ্চ শূন্য। যুবককে আসতে দেখা যাবে। যুবক—ব্যস্তভাবে)

যুবক ॥ কে আছো। সাড়া দাও! শুনতে পারছো, দরজা খোলো।

(ব্যবসায়ীর প্রবেশ—নেপথ্যে-কে জানি।)

ব্যবসায়ী ॥ যাক্ বাঁচা গেল। কটা দিন এমন চলেছে,—একটা মড়া পোড়ানোর দলের দেখা নেই। আমি তো ভাবছিলাম ব্যবসাটা বোধহয় তুলেই দিতে হবে। তা কি কাঠ চাই তোমার—চন্দন, আম, কাঁঠাল না আশশ্যাওড়া ?

যুবক ॥ যে কোনো কাঠ হলেই চলবে। একটু তাড়াতাড়ি চাই শুধু।

ব্যবসায়ী ॥ যে কোনো মানে ?

যুবক ॥ দেখুন, একটি মৃত্যু পথযাত্রী শিশুকে বাঁচাতে হবে। এই মুহূর্তে তাকে উত্তাপ দিতে হবে, তাই।

ব্যবসায়ী ॥ কি বললে, উত্তাপ !

যুবক ॥ হ্যাঁ, এই হিমে তার শরীর নীল হয়ে আসছে। একটি বৈদ্য কোথাও নেই যাকে দিয়ে চিকিৎসা করাবো। তাই অন্তত এই রাতটা কাটানোর জন্য তাকে উত্তাপ দিতে হবে।

ব্যবসায়ী ॥ দাঁড়াও। এ তো ভালো কথা নয়।. তুমি মড়া পোড়ানোর কাঠ চাও না।

যুবক—বললাম তো না, আর দেরী করবেন না।

ব্যবসায়ী—তাহলে ?

যুবক। একটি শিশুর উত্তাপ-এর জন্য এ মুহূর্তে বড় প্রয়োজন—এই নিন, আমি অর্থ সঙ্গে এনেছি।

ব্যবসায়ী ॥ আর কি, আমি রাজা হয়েছি। শোনো, ওসব উত্তাপ-টুত্তাপ চলবে না।

যুবক ॥ কি বলছো তুমি। একটি শিশুর জীবন অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে, তাকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে না ?

ব্যবসায়ী ॥ না। কারণ দেশে আইন আছে। এখন যুদ্ধের সময় মৃত সৈনিক-গুলোই সমগ্র রাজ্যের সমস্যা। তাদের সৎকারই প্রথম কর্তব্য। শিশুর

উত্তাপ নয়—বুঝলে। না আজ আর কোন খরিদ্দার পেলাম না।

(চলে যেতে চায়)

যুবক ॥ দাঁড়াও।

ব্যবসায়ী ॥ বলো।

যুবক ॥ কাঠ দেবে না তুমি ?

ব্যবসায়ী ॥ বললাম তো সম্ভব নয়।

যুবক ॥ কাঠ তোমায় দিতেই হবে।

ব্যবসায়ী ॥ দিতেই হবে। তবু যদি দুখানা হাত থাকতো।

[এই সময় যুবকের দুপাশে দুজন বাচাল এসে দাঁড়ায়]

১ম ও ২য় ॥ এই আমরা দুটিতে ওর দুখানা হাত, কি এবার দেবে ?

ব্যবসায়ী ॥ আমি রাজদ্বারে নালিশ করবো।

যুবক ॥ তার আগে কাঠ দাও, দরজা খোলো।

ব্যবসায়ী ॥ তোমরা লুট করবে নাকি।

যুবক ॥ প্রয়োজনে তাই করবো। ভালো কথা বলছি, তুমি দাম নাও কাঠ দাও।

ব্যবসায়ী ॥ কে কোথায় আছো। বাঁচাও, লুট, লুট। বাঁচাও!

[ব্যস্তভাবে রাজ-অনুচরের প্রবেশ]

অনুচর ॥ কি হয়েছে শ্রেষ্ঠী। আপনারা কে ?

ব্যবসায়ী ॥ আঃ বাঁচালে। ওরা আমাকে শাসাচ্ছিলো কাঠ দিতে হবে।

অনুচর ॥ এ কথা কি সত্য।

যুবক ॥ আমরা দাম দিতে প্রস্তুত।

অনুচর ॥ তাহলে গোল কিসের!

ব্যবসায়ী ॥ ওরা মড়া পোড়ানোর কাঠ চাইছে না। কোন এক অভাগির বেটা, তাকে উত্তাপ দেবে। তাই কাঠ চাই।

যুবক ॥ খবরদার।

অনুচর ॥ শান্ত হও। তাতে অসুবিধা কোথায় ?

ব্যবসায়ী ॥ নিয়ম, ধর্মের নিয়ম আছে না! মড়া পোড়ানোর জিনিস শখ করে আগুন পোহানোর জন্য দেওয়া যায় না।

যুবক ॥ ও তোমার নিজের গড়া নিয়ম। আসলে তুমি দ্বিগুণ দামে বেচতে দাও।

অনুচর ॥ তুমি কে ?

যুবক ॥ প্রাক্তন সৈনিক।

অনুচর ॥ এখানে কি চাই ?

যুবক ॥ বিচার !

অনুচর ॥ তার জন্য রাজদ্বার আছে।

যুবক ॥ কিন্তু বিচারের জন্য যত সময় দরকার, ঐ নিরপরাধ শিশুর জীবনে তত সময় নেই, তাকে বাঁচাতেই হবে।

ব্যবসায়ী ॥ দেখলে তো আস্পর্ধাখানা।

অনুচর ॥ তবু নিয়ম।

[রঙ্গনায়কের প্রবেশ]

নায়ক ॥ অমন নিয়ম আমরা মানি না। ঐ মৃত্যু পথযাত্রী শিশুটিকে আজ আমাদের যে কোন মূল্যে বাঁচাতেই হবে।

অনুচর ॥ (চিনতে পারে)—রঙ্গনায়ক, আপনি।

নায়ক ॥ এটা নতুন ভূমিকা আমার।

অনুচর ॥ তার অর্থ ? আপনি পর্যন্ত নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙছেন। এ যে কি পরিতাপের ! না, এতো চলতে দেওয়া যায় না। মহান রঙ্গনায়ক পর্যন্ত রাজদ্রোহী ! আশ্চর্য। (দ্রুত চলে যাবে)

নায়ক ॥ ভাগ্যে যা ঘটার ঘটুক ! আর তা নিয়ে ভাবনা রাখি না। শ্রেষ্ঠী, তুমি দরজা খুলে দাও—

ব্যবসায়ী ॥ কে রে, আমার নাতজামাই ! কখনও না।

নায়ক ॥ দেবে না ?

ব্যবসায়ী ॥ কখনো না।

যুবক ॥ খুলবে না তুমি ?

ব্যবসায়ী ॥ না, না, না—

নায়ক ॥ এসো ভাইসব, ঐ মানুষ নামের অযোগ্য জন্তুটার কাছে আবেদন করে আজ আর লাভ নেই। নবজাতকের জন্য এসো আজ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইটা শুরু করা যাক্ ! বলো দরজা খোলো—ও—ও—ও

[সমবেতভাবে দরজা ভাঙার ভঙ্গিতে সমস্ত চরিত্ররা দাঁড়িয়ে]

"মাইক আবার সরব হবে"

মাইক ॥ ফলে রঙ্গনায়ক রাজরোষে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বিচারে রাজ-

দ্রোহিতার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কেননা অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজদাক্ষিণ্যকে গ্রহণ করেন নি। কারণ তিনি ছিলেন মানুষের সংগ্রামে, মানুষের সঙ্গে।

কত্তোকালের কথা সব। সময় বদলেছে, তবু আমাদের মধ্যে এমন সাংস্কৃতিক কর্মীর আজো অভাব নেই। যারা রাজ অনুগ্রহপ্রার্থী, তাঁরা তাঁদের ভূমিকাটি হারিয়ে ফেলেছেন।

তাই আজ এই উৎসব প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। মহান রঙ্গনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সময়—আসুন আমরা এই শপথ নিই—"সংস্কৃতি কর্মীর কর্তব্য রাজ-অনুগ্রহ লাভ নয়।

মানুষের যে বাঁচার লড়াই, তাকে মানুষের সামনে—অহংকারের সঙ্গে তুলে ধরা। জয় রঙ্গনায়কের জয়, জয় জনতার জয়।

পথনাটিকা

তামাশা

ঃ চরিত্রলিপি ঃ

খেটে খাওয়া মানুষ ঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়।

জনৈক ব্যক্তি। নায়ক

[দৃশ্য যেখানে আরম্ভ হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের তিনজন খেটে খাওয়া মানুষ কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছচ্ছে।]

প্রথম ॥ ঐ-ঐতো লেখা আছে। হাঁ, ওটাই তো! লোকমঞ্চ। বাবুদের থেটার।

দ্বিতীয় ॥ ঠিক বলেছিস ?

প্রথম ॥ নিশ্চয়।

তৃতীয় ॥ চল তবে, বাবুদের থেটার দেখি।

প্রথম ॥ বাবুদের থেটার দেখি। তোকে ঢুকতে দেবে ?

তৃতীয় ॥ কেনে দেবে না ?

দ্বিতীয় ॥ তোর টিকিট কাটার প্রয়সা আছে ? কি রে ?

তৃতীয় ॥ কত করে, বল ?

প্রথম ॥ দশ বিশ টাকা তো হবেই।

দ্বিতীয় ॥ কি রে, দেখবি ?

[এইরকম সময় হঠাৎ প্রথম চেঁচিয়ে বলে উঠবে]

প্রথম ॥ এক ব্যাটা বাবু আসছে। জিজ্ঞেস করি আয়।

[ওরা উল্লিখিত চরিত্রটিকে লক্ষ্য করে। ঘটনাস্থলে একজন মাঝ বয়সের শহুরে মানুষকে পৌঁছতে দেখা যায়]

প্রথম ॥ বাবু-উ-উ।

ব্যক্তি ॥ (চমকে গিয়ে) অঁা। [সামলে] কি চাই।

প্রথম ॥ না, বলছিলাম কি, থেটার দেখলে ?

ব্যক্তি ॥ ও হো:,!শো-র কথা বলছো ? দেখেছি। [হঠাৎ ওদের চেহারা লক্ষ্য করে] আরে একেবারে তোমাদের মতো মানুষদের কাহিনী! আশ্চর্য।

প্রথম ॥ এ আপনি কি বলতি ছো। আমাদের নিয়ে পালা হয় ?

দ্বিতীয় ॥ আমরা গরীব-গুঠো মানুষ।

তৃতীয় ॥ বাবু রসিকতা করছেন।

ব্যক্তি ॥ না-না। বিশ্বাস করো। হুবহু তোমরা। আর সে কি কষ্টের, দেখা যায় না।

প্রথম ॥ কষ্ট? কষ্ট কেনো?

দ্বিতীয় ॥ ব্যাপারটা খোলসা হলো না বাবু!

ব্যক্তি ॥ তোমাদের দুঃখের ঘটনা আর কি।

প্রথম ॥ ও! আমাদের কেচ্ছা!

ব্যক্তি ॥ না ভাই কেচ্ছা নয়। সত্যিই সব। দর্শকরা পর্যন্ত নায়কের সঙ্গে কেঁদেছে।

প্রথম ॥ কেঁদেছে!

ব্যক্তি ॥ হ্যাঁ।

প্রথম ॥ একখানা কথা বলবো বাবু।

ব্যক্তি ॥ বলো।

প্রথম ॥ একটু কেঁদে দেখাবে? বাবুদের কখনো কাঁদতে দেখিনি আমরা।

দ্বিতীয় ॥ দেখাবে বাবু?

তৃতীয় ॥ তোমার পায়ে পড়ি বাবু।

ব্যক্তি ॥ [বিপদ বুঝে] ঐ তো নাটকের হিরো বের হচ্ছে। কাঁদতে ওস্তাদ। ওকেই বলো। [দ্রুত প্রস্থান]

প্রথম ॥ ব্যাপার কি বলতো দুঃখী। বাবুরা আমাদের জন্য কাঁদছে?

দ্বিতীয় ॥ আরে সে তো নাটকে।

প্রথম ॥ তাই বা কাঁদে কেনো!

প্রথম ॥ বেশ, ঐ যে কে আসছে, তাকেই শুধোই।

[ঘটনা স্থলে নায়ক প্রবেশ করে। মুখ চোখ রুমালে মোছে। তারপর হাঁক দেয়]

নায়ক ॥ ড্রাইভার, গাড়ি বের করো।

প্রথম ॥ [বেশ আব্দারের সুরে] বাবু, থ্যেটার করলে?

নায়ক ॥ [অবাক হয়ে] মানে? তুমি, [অন্যদের দেখে] তোমরা কে?

প্রথম ॥ খুব হাততালি পেলে?

নায়ক ॥ কে তোমরা?

দ্বিতীয় ॥ সে কি গো! আমাদের চিনতে পারছো নে? আমরা রাম-রহিম।

নায়ক ॥ তা কি চাই?

প্রথম ॥ বলছিলাম কি, আমরা গরীব-গুর্ঠো মানুষ। তোমাদের পালা দেখার পয়সা নেই।

নায়ক ॥ তা আমাকে কি পয়সা দিতে হবে? যত্তোসব!

প্রথম ॥ না, বলছিলাম যে, যদি একটু এখেনে একটো করে দেখাও।

নায়ক ॥ কি বললে? সাহস তো কম নয়।

প্রথম ॥ গরীব মানুষের একটা অনুরোধ বাবু!

নায়ক ॥ বিরক্ত করো না। কেটে পড়ো। ড্রাইভার!

দ্বিতীয় ॥ বাবু একবারটি দেখাও।

প্রথম ॥ আমাদের জন্য কাঁদো আর আমাদের দেখাতে নারাজ বাবু!

নায়ক ॥ এটা স্টেজ নয়।

প্রথম ॥ সে যাই বলো। [ওরা একযোগে পথ আটকায়]

নায়ক ॥ তোমরা মাস্তান।

প্রথম ॥ সে আপনি যাই বলো।

নায়ক ॥ তোমরা হুলিগান।

দ্বিতীয় ॥ তাও মঞ্জুর!

নায়ক ॥ আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো।

তৃতীয় ॥ ডাকবে তো ডাকো।

নায়ক ॥ তোমরা সমাজের শত্রু।

প্রথম ॥ তবু করে দেখাতে হবে বাবু। নালে আমরা এখেনে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবো। [নায়কের ভাবান্তর]

নায়ক ॥ বেশ। ড্রাইভার, একটু অপেক্ষা করো। আফটার অল আমি জনগণের শিল্পী। বেশ।

[নায়ক মূকাভিনয়ের সাহায্যে মাটিকাটা, রিক্সা চালানো, ধান ছড়ানোর ভঙ্গি করে। এসব শেষ হতেই চরিত্র তিনটি একযোগে হাত তালি দিয়ে ওঠে]

প্রথম ॥ খাসা নকল করেছো বাবু।

দ্বিতীয় ॥ একদম চাষার মতো।

তৃতীয় ॥ আমাদের মতো মাটি কাটলে!

নায়ক ॥ খুশী তো? এবারে পথ ছাড়ো।

প্রথম ।। তা এসব করে তোমার বেশ নাম-ডাক। কি, তাই না ?

দ্বিতীয় ।। হাততালি পাও।

তৃতীয় ।। পয়সাও মেলে।

নায়ক ।। এর অর্থ ।

প্রথম ।। সে যা করছো করো। কিন্তু আমাদের দুঃখ দেখিয়ে যখন রোজগার হচ্ছে তখন—

দ্বিতীয় ।। আমাদের ভাগটা দাও।

নায়ক ।। তার মানে ?

প্রথম ।। খুব পরিষ্কার। আমাদের ভাগ চাই।

তৃতীয় ।। ছাড়ো, পয়সা ছাড়ো।

প্রথম ।। কৈ দাও, ভাগ দাও।

নায়ক ।। কি হচ্ছে ? আর এগোবেনা বলছি। এই। (চিৎকার। বাঁচাও বাঁচাও :

প্রথম ।। হ্যাঁ, বাঁচাও। আমরাও সেকথাটাই বলতে চাই। এই বাবুগুলানের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। ইয়ারা আমাদের জমি নিয়েছে জরু নিয়েছে, এবারে আমাদের দুঃখুগুলোনকে বেচতে লেগেছে।

নায়ক ।। আমাকে রাস্তা দাও।

প্রথম ।। আগে হিসেব হোক বাবু।

নায়ক ।। কিসের হিসেব ?

দ্বিতীয় ।। বখরার।

নায়ক ।। (অসহায় ভঙ্গিতে) আমাকে ছেড়ে দাও ভাই সব।

তৃতীয় ।। বখরা দাও। তবে ছাড়ব।

নায়ক ।। প্লিজ।

প্রথম ।। তোমায় এক শর্তে ছাড়তে পারি।

নায়ক ।। বলো। কি করতে হবে বলো।

প্রথম ।। কথা দাও, এরপর থেকে তোমাদের ঐ বাবুদের কেচ্ছা বেচে পেট চালাবে ! আমাদের দুঃখু নিয়ে কারবার করবে না। কথা দাও।

দ্বিতীয় ।। বলো।

তৃতীয় ।। বলো, রাজী ?

নায়ক ।। বেশ। এবারে আমাকে যেতে দাও।

প্রথম ॥ দাঁড়াও। তাহলে এখন থেকে কি করবে সেই সব একবার করে দেখাও।

দ্বিতীয় ॥ দেখাও বলছি।

তৃতীয় ॥ শুরু করো।

নায়ক ॥ বেশ। [এই ভাবে নায়ক মাতাল, টেলিফোন করা, কোন বান্ধবীর গলা ধরে বেলেল্লাপনা করা এমন কি সভায় বক্তৃতা করার ভঙ্গিগুলো মূকাভিনয় করে। শেষ হতে ওরা তিন চরিত্র একযোগে হাততালি দেবে]

দ্বিতীয় ॥ এখন থেকে এই করবে। কি বুঝলে? [নায়ক সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকায়]

প্রথম ॥ শুধু আমাদের দুঃখু দেখালে চলবে না। যদি দরদ হও—যদি আমাদের জন্য তোমার দরদ থাকে তাহলে, যে বাবুগুলান আমাদের সব নিয়েছে তাদের কেচ্ছা দেখাও। দেখাও, দেখাও কেমন উয়ারা আমাদের সব নিয়েছে গো…ও…ও…

[প্রথম কান্নায় ভেঙে পড়ে। নায়ক আস্তে আস্তে তাকে তুলে ধরে। আন্তরিক সুরে বলে]

নায়ক ॥ তাই হবে। সেই চেষ্টাই করবো।

তিন জনে এক যোগে ॥ কথা দিলে? (নায়ক খুশিতে মাথা নাড়ে)

তিনজন ॥ তোমার ছুটি। ছুটি গো ছুটি। যাও।

জতুগৃহজাত

: চরিত্রলিপি :

প্রথম ও দ্বিতীয় কবিয়াল । যুধিষ্ঠির । ভীমসেন । ইন্দ্র । ধর্ম ।
পোড়ামুখ । নারী । কুন্তী । বাদকবৃন্দ

[মঞ্চে কবির লড়াইয়ের আসর বসেছে। একজন ঢোলকওয়ালা, একজন কাঁসিওয়ালা, আর দুদিকে দুই কবিয়াল বসে। ঢোলক ও কাঁসি বেজে ওঠে। কবিয়াল দুজনকেই বাজনার তালে তালে শরীর দোলাতে দেখা যায়। বাজনা থামতে প্রথম কবিয়াল উঠে দাঁড়ায়।]

প্রথম কবিয়াল ॥ হরি হে আর কত কি দেখাবে হে

এঘোর কলিকালে।

বাঘের সঙ্গে লড়াই দিয়ে

তুমি জেতাবে শেয়ালে ॥

[ঢোলক কাঁসি বেজে ওঠে। প্রথম সরাসরি দ্বিতীয় কবিয়ালকে লক্ষ্য করে]

কবির লড়াই করতে নেতাই

বাবুরা ডাকলো কিনা তোকে!

এ কেমন বিচার বাবুর আমার,

কিছু মাথায় না যে ঢোকে ॥

[ঢোলক কাঁসি এবারে আরো দ্রুত তালে বাজতে থাকে। আস্তে আস্তে দ্বিতীয় জন উঠে দাঁড়ায়]

দ্বিতীয় কবিয়াল ॥ ও তোর গোবর-পোরা মাথাটাকে

বাঁচাতে আজ ধররে মা'কে।

মা সরস্বতী বিনে এবার

পবন তোর নেইকো উদ্ধার ॥

[ঢোলক কাঁসি সঙ্গ দেয়।]

প্রথম কবিয়াল ॥ ওরে নিতে আজ গুরুতে

দিবি৷ রাখি কেটে।

চাপান উতোর কল্যাণে তোর

দেখো অনেক ছেঁটে ॥

দ্বিতীয় কবিয়াল ॥ নিজের নাক নিজের মতো বাঁচা।

নাম নিয়ে তুই পবনকুমার,

নাম ডোবাচ্ছিস বাপঠাকুর্দার,

হনুমান হতে গিয়ে

তোর কুলের খুললি কাছা ॥

প্রথম কবিয়াল ॥ সময় নষ্ট করতে পষ্ট

চেষ্টা দেখি কত

নিতাইরে তোর নিস্তার নেই

আজকের দিনের মতো ॥

বলতো নিজে স্বর্গে যেতে

কারে নরক দেখায় হাত্তি।

কোন বা দেশে জন্মেছিল,

কিবা তাহার জাতি ॥

[ঢোলকওয়ালা ও কাঁসিওয়ালা নাটক জমে উঠেছে দেখে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করে]

দ্বিতীয় কবিয়াল ॥ পবনরে তোর ধর্মে হলো মতি।

জবাব দেবার আগে বন্দি

দেব বৃহস্পতি ॥

মন দিয়ে শোনরে পবন

জেনে রাখরে স্থির।

হাত্তির হাতে

নাকাল হলো

বল্ কে ?

বল্ কে ?

হলো রাজা যুধিষ্ঠির ॥

প্রথম কবিয়াল ॥ ইতি গজ বলে বুঝি

নরক দর্শন হলো।

নিতাই খাসা জবাব

দেছে সবাই হরি হরি বলো ॥

[ঢোলক ও কাঁসর দ্রুত তালে বাজতে আরম্ভ করে]

অৰ্দ্ধসত্য মিথ্যা হতে

বহুগুণে ভারী।

ইন্দ্র ॥ না। ঐ সারমেয়···।

যুধিষ্ঠির ॥ সারমেয় ? [স্মরণ হতো] ও! কিন্তু ঐ প্রাণীটি আমার ভক্ত। ভক্তকে পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নয় দেবরাজ। আমাকে মার্জনা করুন।

ইন্দ্র ॥ মহারাজ। তুমি আমার তুল্য ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হতে চলেছো। ঐ তুচ্ছ প্রাণীর মায়া ত্যাগ করো।

যুধিষ্ঠির ॥ ওই সারমেয় দুর্বল। দুর্বলকে রক্ষা করা আমার ব্রত।

ইন্দ্র ॥ স্বর্গলোকে ওই প্রাণীর কোন স্থান নেই ধর্মপুত্র।

যুধিষ্ঠির ॥ আশ্রিতকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত দেবরাজ

ইন্দ্র ॥ মিথ্যা এ মোহ ত্যাগ করো কুন্তীপুত্র।

যুধিষ্ঠির ॥ না। স্বর্গলাভের বিনিময়েও এ অন্যায় সম্ভবপর নয়। [দৃশ্যে ধর্মবেশী অভিনেতার প্রবেশ]

ধর্ম ॥ কুন্তীপুত্রের জয় হোক। সারমেয়ের ছদ্মবেশ নিয়ে আমি তোমার ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। জীবকুলের প্রতি তোমার দয়া দেবতাদের চাইতেও মহৎ।

ইন্দ্র ॥ কুন্তীপুত্র, তুমি প্রকৃতই সৌভাগ্যশালী। স্বয়ং ধর্ম তোমার গুণগানে লিপ্ত। আশ্রিতের প্রতি তোমার করুণা অপরিসীম।

[নেপথ্যে : 'মিথ্যা কথা।' অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মঞ্চে আগুনে পুড়ে যাওয়া মুখ পিকাসী কেনী চরিত্রের প্রবেশ]

পোড়ামুখ ॥ মিথ্যা কথা। এমন নির্লজ্জ প্রশংসা সম্ভবত দেবতাদের অভ্যাস।

ধর্ম ॥ কে তুমি ? কি তোমার অভিপ্রায় ?

পোড়ামুখ ॥ ধর্মদেব, আপনি সত্যিই আমাকে চিনতে পারছেন না ? দেবরাজ ইন্দ্র এবং কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির উপস্থিত আছেন। আপনি সত্য প্রকাশ করুন।

যুধিষ্ঠির ॥ (ধর্মকে নিরুত্তর দেখে) এ কে দেবরাজ ? (ইন্দ্রও নিরুত্তর) এ কি প্রহেলিকা! মাটির পৃথিবী থেকে এখানে, এই উর্দ্ধলোকে, এই দেবভূমিতে······। কে, কে এই কুৎসিৎ দর্শন ? একি কোনো দুরাত্মা না ছদ্মবেশী কোনো দেবতা ? (প্রকাশ্যে) কে তুমি ?

পোড়ামুখ ॥ আমি ? আমি এক ভাগ্যহত।

যুধিষ্ঠির ॥ উত্তম। এখানে কি চাই ?

পোড়ামুখ ॥ তোমার কাছে একটি প্রশ্নের মীমাংসা চাই দেব।

যুধিষ্ঠির ॥ কি এমন প্রশ্ন তোমার। যার জন্ম এত দূর পর্যন্ত তুমি অনুসরণ করেছো।

পোড়ামুখ ॥ ধর্মপুত্র, সংসারে যে কারো প্রাণ রক্ষা করে তার প্রাপ্য কী ?

যুধিষ্ঠির ॥ কৃতজ্ঞতা।

পোড়ামুখ ॥ [আত্মতৃপ্তিতে] জয়, কুন্তীপুত্রের জয়। আমি জানতাম, জানতাম তুমি সুবিচার করবে। কিন্তু কেউ যদি সেই কৃতজ্ঞতার কথা বিস্মৃত হয় ?

যুধিষ্ঠির ॥ তবে সে কৃতঘ্ন। [হঠাৎ সচেতন হয়ে] কিন্তু এ সমস্ত প্রশ্ন তুমি আমাকে করছো কেন ? এবং কেন ঠিক এই মুহূর্তেই ? পৃথিবীতে বসবাসের কালে অনুরূপ বহু জটিল প্রশ্নের আমি মীমাংসা করেছি।

পোড়ামুখ ॥ দুর্ভাগ্য এই যে পৃথিবীতে তোমাকে এই ভাবে পাওয়ার কোনো উপায় ছিলনা।

যুধিষ্ঠির ॥ উপায় ছিলনা ! আশ্চর্য।

পোড়ামুখ ॥ (ভাবান্তর) বহুকাল হলো, এক রাজা হওয়ার খেলায় আমরা দুটি ছিলাম। রাজা যে হওয়ার সে হলো। কিন্তু আমরা....। আমার দুঃখিনী মা এবং আমরা পাঁচ ভাই সবাই অন্তলোকের বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

যুধিষ্ঠির ॥ জননী ও তাঁর পঞ্চপুত্র ? কি আশ্চর্য।

পোড়ামুখ ॥ [আগ্রহ ভরে] মনে পড়ছে ? আঃ। আমি জানতাম। আমি জানতাম তুমি, তুমি ধর্মপুত্র বিস্মৃত হবেনা। একবার স্মরণ করো কুন্তীপুত্র।

যুধিষ্ঠির ॥ না। না। এ প্রহেলিকা। আমি তোমাকে চিনি না।

পোড়ামুখ ॥ আমাকে তুমি সত্যিই চিনতে পারছো না যুধিষ্ঠির? দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বয়ং ধর্মও যদি না চিনতে পারেন, তবু তোমার, তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ॥ জীবনে যদি সামান্যতম পুণ্য করে থাকি, যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মেরই জয় হয়ে থাকে, যদি আমার ধর্মপুত্র হিসাবে খ্যাতি এ সমস্তই সত্য হয়ে থাকে, তবে সে সমস্ত কিছুর নামে শপথ করে বলছি, সত্যিই তুমি আমার কাছে অপরিচিত। তুমি কি কোনো শাপগ্রস্ত দুরাত্মা? এই পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মাঝখানে বন্দী হয়ে আছে? [এত সময় পর্যন্ত ধর্ম ও ইন্দ্র নীরবে সব কিছু শুনছিলেন। হঠাৎ তাঁরা দুজনেই দৃশ্যের বাইরে চলে যান]

পোড়ামুখ ॥ জানি, জানি তুমি স্মরণ করতে পারবে না? জানতাম তুমি আমাকে দেখে চিনে উঠতে পারবে না। আমি তো সত্যি সত্যি তখন এমন বিভৎস দর্শন ছিলাম না।

যুধিষ্ঠির ॥ [ধর্ম ও ইন্দ্রকে দৃশ্যে না দেখতে পেয়ে স্বগত] একি, দেবরাজ ইন্দ্র কোথায়? ধর্মই বা কোথায় গেলেন? তবে কি আমি মায়াবলে বিভ্রান্ত?

পোড়ামুখ ॥ প্রকৃতই তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

যুধিষ্ঠির ॥ আমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তুমি তা বিশ্বাস করো না?

পোড়ামুখ ॥ সারা জগৎ যা বিশ্বাস করে আমি কেন তা করবো না। বিশ্বাস করি বলেই তো তোমার কাছে আসা ধর্মপুত্র। তোমার কৃপায় যে আমরা নিষাদ জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছি কুন্তীপুত্র!

যুধিষ্ঠির ॥ নিষাদ!

পোড়ামুখ ॥ হ্যাঁ, নিষাদ। মনে পড়েছে? আঃ ধর্মপুত্র, তুমি আমাকে আশ্বস্ত করলে। [স্মৃতিচারণ] বারণাবত নগরে বহুকাল আগে সেই যে পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী দরিদ্র আর ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন...।

যুধিষ্ঠির ॥ [বিচলিত] তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? এই মুহূর্তে আমি যখন দেবরাজ ইন্দ্রের অতিথি তখন.....। এ নিশ্চয় কোনো দুরাত্মার কৌশল! তুমি বিদায় হও। আমার যাত্রাপথ মুক্ত কর।

পোড়ামুখ ॥ জীবন দিয়ে তোমার স্বর্গারোহণের পথ তৈরী করেছি ধর্মপুত্র।

আজ কেন বাধা দেব ? শুধু বলো, তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো ?

যুধিষ্ঠির ॥ বৃথা আমাকে দিয়ে মিথ্যা বলানোর চেষ্টা করছো।

পোড়ামুখ ॥ আজ তুমি তাই বলবে ধর্মপুত্র। নিষাদ কিলকের পুত্রকে তুমি চিনতে পারবেনা জানতাম। [উত্তেজিত] কিন্তু আজ তোমাকে ছাড়ছি না যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ॥ স্তব্ধ হও দুরাত্মা। সংসারের সকল পরাক্রমকে যে অবহেলায় পরাস্ত করেছে—তুমি তাকে স্পর্দ্ধা দেখাও !

পোড়ামুখ ॥ একটা চূড়ান্ত হিসাব করতে হবে আজ।

যুধিষ্ঠির ॥ পাপিষ্ঠ ! কিসের হিসাব ?

পোড়ামুখ ॥ কেন, পাপপুণ্যের।

যুধিষ্ঠির ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ও ধর্ম আমাকে রক্ষা করুন। [নেপথ্যে ইন্দ্র ও ধর্ম একযোগে : তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ যুধিষ্ঠির।]

যুধিষ্ঠির ॥ [নিশ্চিন্তে] বলো কি করলে তোমার সন্তোষ হবে।

পোড়ামুখ ॥ শুধু চিনতে পারলে। কেবল মাত্র স্বীকৃতি পেলে।

যুধিষ্ঠির ॥ স্বীকৃতি ! কিসের স্বীকৃতি ?

পোড়ামুখ ॥ আত্মত্যাগের।

যুধিষ্ঠির ॥ সংসারে সব আত্মত্যাগেরই স্বীকৃতি আছে আগন্তুক।

পোড়ামুখ ॥ জানি। কিন্তু আমি, আমার দুঃখিনী মা, আমরা পাঁচ ভাই, আমাদের কেউ মনে রাখেনি।

যুধিষ্ঠির ॥ কেউ না ! আশ্চর্য !

পোড়ামুখ ॥ এমন কি ধর্মপুত্র তুমিও না।

যুধিষ্ঠির ॥ আমি !

পোড়ামুখ ॥ হ্যাঁ তুমি। যে মহাপ্রস্থানের পথে তুমি আজ যাত্রা করেছো সেই

পথ কটি দরিদ্র নিরপরাধ নিষাদের প্রাণের বিনিময়ে এমন সুগম হয়েছে।

যুধিষ্ঠির ॥ ভ্রম। আমার ধর্মাচরণই আমাকে এই অধিকার দিয়েছে।

পোড়ামুখ ॥ ধর্মপুত্র, অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আজ তোমার ধর্ম নিয়ে এত গৌরব? কেবল সেদিন কিভাবে রক্ষা পেয়েছিলে তা মনে করতে পারছো না।

যুধিষ্ঠির ॥ ধর্মই আমাদের রক্ষা করেন।

পোড়ামুখ ॥ কিন্তু আমাদের রক্ষা করেনি যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ॥ তোমরা ধর্মপ্রাণ ছিলে না হয়তো....।

পোড়ামুখ ॥ কি বললে?

যুধিষ্ঠির ॥ আগন্তুক, ধর্মের পথ বড় জটিল।

পোড়ামুখ ॥ ইন্দ্রলোকে যাত্রার আগে তোমাকে সেই কথাটিই স্মরণ করাতে আসা ধর্মপুত্র।

যুধিষ্ঠির ॥ তোমার উপস্থিতির মধ্যেই একটা অশুভ ইঙ্গিত আছে। ধর্মতত্ত্ব তোমাকে সাজে না।

পোড়ামুখ ॥ আমার যে কুৎসিত মুখমণ্ডল তোমাকে অনুরূপ মন্তব্যের সাহস দিয়েছে তা তোমারই উচ্চাশার পরিণাম।

যুধিষ্ঠির ॥ উচ্চাশা।

পোড়ামুখ ॥ হ্যাঁ, উচ্চাশা। কৌরবদের পরাস্ত করে পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা।

যুধিষ্ঠির ॥ কৌরবরা অধর্ম করেছেন।

পোড়ামুখ ॥ তুমি কে তার বিচার করার?

যুধিষ্ঠির ॥ আমি উপলক্ষ্য মাত্র। বরং ধর্মই তার বিচার করেছেন।

পোড়ামুখ ॥ ধর্মের দোহাই দিয়ে তুমি সংসারে যে কাজের জন্য জীব চিরকাল ধিক্কার দেয়, তুমি, তুমি যুধিষ্ঠির সেই আত্মীয়মেধ যজ্ঞ করেছো।

যুধিষ্ঠির ॥ বলেছি। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

পোড়ামুখ ॥ ধর্মের জটিল তত্ত্ব আমি জানি না। শুধু জানি, সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে তুমি কেবল উপলক্ষ্য ছিলে না। তুমিই ছিলে মূল সংগঠক।

যুধিষ্ঠির ॥ [এত সময় পর আবার বিচলিত] ভয়ঙ্কর রাত্রি!

পোড়ামুখ ॥ হাঁ, পৃথিবীতে সেরকম ভয়ঙ্কর রাত্রি বড় অল্পই আসে। আগুনে সমস্ত শরীর ঘিরে ধরতে জ্ঞান ফিরলো। চোখ মেলতে গিয়ে দেখলাম চারদিকে বিভৎস চিতা জ্বলছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'মা, মাগো! আমাকে বাঁচাও।' [মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে। আলো ফিরে এলে দেখা যায় লেলিহান আগুনের মাঝখানে এক নারী মূর্তি।]

নারী ॥ এ আমার কি হলো যুধিষ্ঠির। আমার সমস্ত শরীর দগ্ধ। ঐ দেখ আমার পঞ্চপুত্র জতুগৃহের আগুনে মৃত।

যুধিষ্ঠির ॥ [বিভ্রান্তের মতো] জতুগৃহ! কে, কে তোমরা? [সমস্ত দৃশ্য লক্ষ্য করে] ও কি ভয়ঙ্কর ওই দৃশ্য। কে তুমি? মাতা কুন্তী? সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীমসেন তোমরা, তোমরা ওই ভাবে? [সম্বিৎ ফেরে] না না। তোমাদের তো আগুনকে স্পর্শ করার উপায় নেই। পৃথিবীর আগুন অথবা জল থেকে বহু উর্দ্ধে দুর্গম এই মহাপ্রস্থানের পথে তোমরা বিশ্রামরত। না না, বলো কে তুমি ভয়ঙ্কর প্রতিমা?

নারী ॥ আমি এক সামান্য নিষাদ রমণী। বারণাবত নগরে ধর্মপুত্র তুমি সাদরে আমন্ত্রণ করে এনেছিলে। এনেছিলে, মাতা কুন্তীদেবীর ব্রত উদযাপনের জন্য। কি একি হলো যুধিষ্ঠির! বহুকাল এমন আপ্যায়ন পায়নি বলে বাছারা আমার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। তারা বলেছিল, 'মাগো, কতবড় হৃদয় পাণ্ডবদের। মাগো, পাণ্ডবরা বড় পুণ্যাত্মা।'

যুধিষ্ঠির ॥ [উত্তেজিত] না না। এ বিভ্রম মাত্র। এ কখনোই সত্য নয়।

নারী ॥ নিরস্ত হও স্বর্গবাস অভিলাষী। বিশ্বজগত তোমাকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলে জানে। আমি, আমিও যতকাল জতুগৃহের আগুনে পুড়ে মরিনি ততকাল তোমার জয়ধ্বনি দিয়েছি। তবু কুন্তীপুত্র, তুমি আশ্রিত জেনেও আমাদের রক্ষা করোনি।

যুধিষ্ঠির ॥ স্তব্ধ হও। সামান্য একটি সারমেয়, দেবরাজ ইন্দ্র তাকে পরিত্যাগ করতে বলায় আমি সেই আশ্রিত প্রাণীর বিনিময়ে স্বর্গবাসের সুখ ত্যাগ করতে চেয়েছি।

নারী ॥ তবু তুমি, তুমি ধর্মপুত্র……। যে তুমি ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে সাদর আমন্ত্রণ

জানিয়ে আমাদের এনেছিলে। যে কুন্তীদেবী আমাদেরকে বিশেষ ভাবে সমাদর করেছিলেন, জতুগৃহে আগুন লাগানোর সময় সেই তোমরা নিশ্চিত জেনেও আমাদের জাগাওনি।

যুধিষ্ঠির ॥ বারবার জতুগৃহের উল্লেখ করে তুমি স্বর্গ আরোহণের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাকে বিচলিত করতে চাও! তুমি অতৃপ্ত অশরীরী আত্মামাত্র।

নারী ॥ চমৎকার তোমার ধর্মবোধ। সসাগরা পৃথিবীর হে পুণ্যবান অধিপতি, বিপদকালে আশ্রিতজনদের ফেলে রেখে আত্মরক্ষা করতে তোমার ধর্মবোধে একটুকু বাধেনি!

যুধিষ্ঠির ॥ সমস্ত জীবেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে।

নারী ॥ কিন্তু আমাদের ছিল না।

যুধিষ্ঠির ॥ তোমরা দুর্বল। তাই হঠাৎ বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলে।

নারী ॥ হঠাৎ বিপদ! হায় যুধিষ্ঠির! তুমি, তুমিও মিথ্যা ভাষণে পটু।

[ক্রমশ দৃশ্য থেকে নারী মূর্তি সরে যায়]

পোড়ামুখ ॥ ধর্মপুত্র, জনশ্রুতি এই যে সেই অগ্নিকাণ্ড ছিল সুপরিকল্পিত।

যুধিষ্ঠির ॥ অসম্ভব। মিথ্যা জনশ্রুতি।

পোড়ামুখ ॥ মিথ্যা! এর জন্য যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয় তবে মহামুনি ব্যাসদেবকে অভিযুক্ত করো ধর্মপুত্র। যদি সাহস থাকে তাঁর লিখিত বিবরণকে অস্বীকার করো।

যুধিষ্ঠির ॥ ওঃ। আমি ক্লান্ত। জানি না তুমি দুরাত্মা না ছদ্মবেশী। আমার যাত্রাপথ মুক্ত কর।

পোড়ামুখ ॥ তোমার যাত্রাপথ সুগম করতেই আমাদের আত্মত্যাগ। তবু আজ যখন কথা উঠেছে সংশয়ের অবসান হোক। স্বর্গে ক্ষণকাল পরে যেও যুধিষ্ঠির। তার আগে মহামুনি ব্যাসদেবকে সাক্ষ্য দিতে দাও।

যুধিষ্ঠির ॥ সাক্ষ্য?

পোড়ামুখ ॥ হ্যাঁ, সাক্ষ্য। আর শুধুমাত্র ব্যাসদেব কেন, আসমুদ্র হিমাচলের এই ভারতবর্ষে শত সহস্র বৎসর ধরে অমৃত সমান মহাভারতের কথা পঠন ও শ্রবণের মধ্য দিয়ে সেই নির্মম ঘটনার প্রত্যেকেই সাক্ষী হয়ে আছে।

[নেপথ্যে কবিয়ালদের গুণগুণ]

জতুগৃহ পর্বেতে তার
উল্লেখও যে পাই।
সেই কথাটি সভাস্থলে
সবাইকে জানাই॥

পোড়ামুখ ॥ ওই শোন ধর্মপুত্র। [দৃশ্যে কবিয়ালরা প্রবেশ করে। ঢাক ও কাঁসি বাজে]

প্রথম কবিয়াল ॥ পাণ্ডবের নিধন লাগি
পুরচন সনে
দুর্যোধন ফন্দি আঁটে
বসিয়া গোপনে।
শলামত এই বিধি
করা হয় স্থির।
সহজ দাহ্য বস্তু দিয়ে
গড়াবে কুটির॥
তীর্থ লাগি পাণ্ডবেরা
গেলে সেই দেশে।
আগুনে পোড়ায়ে
শত্রু করা হবে শেষে॥

দ্বিতীয় কবিয়াল॥কিন্তু পবন এই কথাটি
জানে সর্বজন।
যথা কালে হয় নাকো
পাণ্ডব নিধন॥
আগুনে পুড়িল গৃহ

পোড়ে মল বিক।

দুর্যোধনের দুষ্কর্মে

দেয় সবে ধিক্‌ ॥

তথাপি না পোড়া যায়

পাণ্ডুপুত্রগণ

কিবা ছিল তার পিছে

বিশেষ কারণ ॥

প্রথম কবিয়াল ॥ চলরে নিতে দুই জনেতে

সঙ্গে করি গান।

দেখে আসি, কিবা ছিল,

বিধির বিধান।

[ঢোলক কাঁসি বাজতে থাকে। দৃশ্য ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয় মঞ্চে যুধিষ্ঠির ও কুন্তী দেবী।

কুন্তী ॥ আমাদের এই স্থান ত্যাগ যখন আসন্ন, তখন কেন এই আপ্যায়নের আয়োজন করেছো পুত্র। পরম শুভার্থী খণক এই গৃহমধ্যে অসম্ভব অধ্যবসায় নিয়ে যে গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ খনন করেছেন জনসমাগমের কেউ তা লক্ষ্য করলে আমাদের যে বিপদ হতে পারে।

যুধিষ্ঠির ॥ দয়াময়ী পাণ্ডব জননী। বারণাবত হতে বিদায়ের আগে নগরবাসীদের নিজহাতে সমাদর করবেন না মাতঃ ?

কুন্তী ॥ যুধিষ্ঠির, তুমি বিচক্ষণ। তবু এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

যুধিষ্ঠির ॥ বারণাবতে আসার পথে মহামতি বিদুর আমাকে কিছু পরামর্শ

দিয়েছিলেন। মনে পড়ে ?

কুন্তী ॥ হ্যাঁ মনে পড়ে। কিন্তু তোমরা উভয়ে সেদিন সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছিলে।

যুধিষ্ঠির ॥ হ্যাঁ জননী, সেদিন তার প্রয়োজন ছিল।

কুন্তী ॥ তাই গোপনীয়তা ?

যুধিষ্ঠির ॥ বিদুর বলেছিলেন, দুর্মতি দুর্যোধন পূর্বাহ্নেই দুরাত্মা পুরচনকে দিয়ে সহজ দাহ্য পদার্থ দিয়ে এক সুরম্য গৃহ নির্মাণ করিয়ে রাখবে আমাদের জন্য এবং আমরা যখন নিশ্চিন্তে সেখানে বাস করবো তখন পুরচন গৃহে অগ্নিসংযোগ ঘটাবে।

কুন্তী ॥ হায় নীচ দুর্যোধন !

যুধিষ্ঠির ॥ মিত্র কনককে মহামতি বিদুরই পাঠিয়েছিলেন মাতা।

কুন্তী ॥ যথার্থ পুণ্যাত্মা তিনি। তবু আজকের এই আয়োজনের প্রয়োজন কোথায় পুত্র ?

যুধিষ্ঠির ॥ আছে মাতঃ, আছে। দুরাত্মা পুরচন কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবেন না যে এই রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই জতুগৃহ ছেড়ে সুড়ঙ্গ পথে আমরা নিরুদ্দেশ হবো। গৃহত্যাগের আগে, কেউ কি উৎসব করে জননী ?

কুন্তী ॥ কিন্তু···। ওই সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব জানা মাত্র আমরা আর নিরাপদ থাকব না পুত্র।

যুধিষ্ঠির ॥ জানি মাতঃ, জানি। তাই তো এই আয়োজন।

কুন্তী ॥ আশ্চর্য।

যুধিষ্ঠির ॥ এই নগরের মানুষেরা যেখানে ভোজনে বসেছেন একবার সেদিকে লক্ষ্য করুন পাণ্ডব জননী।

[কুন্তী যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতক্রমে লক্ষ্য করে]

কুন্তী ॥ আঃ। পরম তৃপ্তি সহকারে সবাই ভোজন করছেন। তাঁরা তোমাদের গুণগান করছেন। [হঠাৎ বিস্ময়ে] কিন্তু যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির ॥ আদেশ করুন মাতঃ।

কুন্তী ॥ ওই রমণী এবং তার পাশে পাঁচটি মানুষ আনন্দে খাদ্য গ্রহণ করছে, ওরা কারা পুত্র ?

যুধিষ্ঠির ॥ আমাদের মুক্তি-মূল্য।

কুন্তী ॥ [বিস্ময়ে] এও কি সম্ভব! মাতা এবং পঞ্চ পুত্র!

যুধিষ্ঠির ॥ পাণ্ডব জননী। আপনি নিজ হাতে ওদের পরিচর্যা করুন।

কুন্তী ॥ কিন্তু, কেন? যুধিষ্ঠির?

যুধিষ্ঠির ॥ কারণ ওই নিষাদ পরিবার, মাতা এবং পঞ্চ পুত্র দুর্মতি দুর্যোধনের মনের সন্দেহ দূর করবে।

কুন্তী ॥ কি উপায়ে? সত্বর বল, কি ভাবে?

যুধিষ্ঠির ॥ নিজ হৃদয়কে কঠিন করুন জননী। কৌশলে যাতে ওই নিষাদ পরিবারটিকে জতুগৃহে আনা যায়, শুধু মাত্র তারই জন্য এই উৎসব আয়োজন। আপনার পরিচর্যায় ওরা নিশ্চিত নিরাপদ বোধ করবে। তারপর সব অতিথি চলে গেলে, যখন শুধুমাত্র ওই পরিবার অবসন্ন শরীর নিয়ে প্রাঙ্গণে ঘুমিয়ে পড়বে—তখন, তখন আমরা সুড়ঙ্গ পথ ধরবো। তার আগে গৃহে অগ্নিসংযোগ করবো। এটাই মহামতি বিদুরের উপদেশ মাতঃ।

কুন্তী ॥ কিন্তু ওদের কি হবে পুত্র? ওরা যে বড় বিশ্বাস নিয়ে এসেছে।

যুধিষ্ঠির ॥ সেই জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবে জননী।

কুন্তী ॥ ওঃ, কি ভীষণ যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির ॥ অধম সন্তানকে ক্ষমা করুন। [ভাব পরিবর্তন] দ্রুত পরিচর্যা শেষ করে ভ্রাতৃগণকে নিয়ে আপনি প্রস্তুত হোন জননী!

কুন্তী ॥ যুধিষ্ঠির! আমি যে মা।

যুধিষ্ঠির ॥ ধর্ম আমাদের সাহস দিক। [দৃশ্য থেকে যুধিষ্ঠির চলে যাবে]

কুন্তী ॥ [স্বগত] একে একে অতিথিরা ফিরে গেছে। বিদায় কাল আসন্ন। পরম নিশ্চিন্তে ওই নিষাদ রমণী ও তার পঞ্চপুত্র নিদ্রা যাচ্ছে। নিদ্রা যাওয়ার আগে ওরা পাণ্ডবজননীর জয়ধ্বনি দিয়েছে! হায় বিদুর! এ কেমন ধর্মরক্ষা। [নেপথ্যে যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বর]

যুধিষ্ঠির ॥ পাণ্ডব জননী, আপনি ভ্রাতৃগণ সহ দ্রুত অগ্রসর হোন।

কুন্তী ॥ [ব্যাকুল] এ কেমন মুক্তি যুধিষ্ঠির? হায় ধর্ম, এ কেমন আচরণ

তোমার! [কুন্তী ধীর পদক্ষেপে মঞ্চের বাইরে চলে যাচ্ছেন। মশাল হাতে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির ॥ ধর্মই প্রবল। আমি নিমিত্ত মাত্র। দুর্যোধন, আগুনে দগ্ধ হওয়া ওই কটি নিষাদ শরীর তোমাকে নিশ্চিন্ত করবে। পাণ্ডবদের নিধন জেনে তুমি আনন্দিত হবে। মূঢ়, ধর্মই যেখানে রক্ষক সেখানে তোমার সমস্ত আয়োজনই যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, তুমি তা জানো না। [হঠাৎ খেয়াল হতে মশাল দিয়ে খুঁজতে থাকে। মশাল নিয়ে মঞ্চের বাইরে যেতে যেতে]

যুধিষ্ঠির ॥ একি, কোথায় সেই কুৎসিত দর্শন আগন্তুক! [ফিরে আসে। মশাল হাতে] দেবরাজ ইন্দ্র এবং ধর্মই বা কোথায়? এ আমি কোথায়? [চিৎকার করে যুধিষ্ঠির স্থির হয়ে যায়। কবিয়ালরা মঞ্চে প্রবেশ করে]

কবিয়াল গান ॥ ইতি গজ হইতে পূর্বে

আরো পাপ ছিল।

সেই পাপে যুধিষ্ঠির

নরক দেখিল।

[মঞ্চে পোড়ামুখ ভিন্ন সমস্ত চরিত্ররা সারি বেঁধে দাঁড়ায়। গানটি ফিরে ফিরে গীত হয়। মঞ্চের সম্মুখ ভাগ দিয়ে পোড়ামুখ উঠে এসে দাঁড়ায়]

পোড়ামুখ ॥ মিথ্যা কথা। একি শুধু যুধিষ্ঠিরের একার পাপ? শত সহস্র বৎসর ধরে আসমুদ্র হিমাচলের ভারতবর্ষে যারা অমৃত সমান মহাভারতের কথা পঠন, পাঠন, বা শ্রবণ করেছেন, একি তাদেরও পাপ নয়? আজ যাঁরা দর্শক আসনে আছেন একবার, একবারও কি তাঁদের মনে হয়েছে, কেন নিরপরাধ একটি নিষাদ পরিবারকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? তারা পাণ্ডবদের মুক্তিতে নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন। একবারও ভাবেননি কোন মূল্যে সেই মুক্তি এসে ছিল। একি শুধু মহাভারতের কালের কাহিনী? এখনও কি আমাদের মতো সহায় সম্বলহীন মানুষেরা উচ্চাভিলাষী মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর মিথ্যা আদর্শের শিকার হচ্ছে না?

কবিয়ালগণ ॥ শুন শুন সভায়

যত সাধুগণ

কখনো হয় না ভালো

হেন মুক্তি পণ ॥

যুগে যুগে ঘটে যত

হেন অবিচার।

এখনো কি সহিবে সবে।

কয় হে নির্বিকার ॥
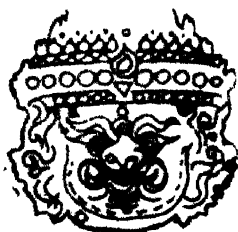
[মঞ্চে যবনিকা নেমে আসে]

সাত গাঁয়ের সঙ্

: চরিত্রলিপি :

পান্না সাপুই, লোকটি ও মুখোশ, ছিদাম, দুর্যোধন, নিধিরাম, খগেন, হারাধন, শিবু, মধু, এক ব্যক্তি, ফকিরচাঁদ, সুজন পাল, রঘু, ফুলবাবু, ভুজঙ্গ, পদ্মরাণী ও জনতা। গানের দল।

[স্থান : সাত গাঁয়ের পাকুড়তলা। সময় মধ্যরাত্রি। ঘন অন্ধকারের মধ্যে দৃশ্যে সাত গাঁয়ের মহাজন পান্না সাঁপুইকে দেখা যায়। সাঁপুই-এর প্রায় গা ঘেঁসেই এসে ঢোকে অপর একটি লোক। অন্ধকারে চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে পান্না সাঁপুই হুকুম করে।]

পান্না ॥ নে এবারে ধর। [পরক্ষণেই] আচ্ছা একটু থাম। একবার ভালো করে আলোটা মেরে দেখ দেখি।

লোকটি ॥ [টর্চ জেলে চারদিকটা একবার দেখে নেয়।]

পান্না ॥ হ্যাঁরে, তোকে যেন কার মতো দেখতে লাগছে···!

লোকটি ॥ কার মতো আবার! আমার মতো। তা আলো কি জেলে রাখবো?

পান্না ॥ খবরদার। [খেঁকিয়ে উঠে] আলো জেলে রাখবো! ঐ আলো দেখে লোক ছুটে আসুক আর কি। মেলা চালাকি না মেরে এবারে গানটা ধরো।

লোকটি ॥ তা হলে শুরু করি?

পান্না ॥ [সন্দেহের সুরে] তোর গলাটা বড্ড চেনা চেনা ঠেকছে। কি আশ্চর্য।

লোকটি ॥ কিছু বলছো আপনি?

পান্না ॥ ভেবেছিস মাল টেনে আছি। ওরে হারামজাদা, পান্না সাঁপুই মাল টানলে চোখে আরো ভালো দেখতে পায়। নে ধর।

লোকটি ॥ শুনলে কিন্তুক তোমার রাগ হবে।

পান্না ॥ থাম শালা। রাগবো না হাসবো তুই তা বলার কে শুনি? বজ্জাৎগুলো আমায় নিয়ে এবারে কি গান বেঁধেছে একবার শুনি, তারপর মজা দেখাবো। নে, শোন। [লোকটি গান ধরে]

॥ গান ॥

এক যে ছিল খ্যাঁক শিয়ালি
সপ্তগ্রামের বনে—
সাক্ষাৎ সেই যোমের কথা
শোনাই সর্ব জনে ॥
নামের শেষে সাঁপুই যে তার
লেজের পায়া আছে।
সেই শেয়ালির গুণপনা,

পান্না ॥ তারপর ? চালিয়ে যা।

বেনামীতে আধখানা গ্রাম
দখল করে রাখি—
ঝাণ্ডুঘুঘুর দলের সাথে
করে যতেক মাখামাখি ॥

পান্না ॥ সাবধান।

লোকটি ॥ (ভয় পাওয়া গলায়) থামবো ?

পান্না ॥ না। শেষ কর।

লোকটি ॥ সামনে তারে মোড়ল বলে
যতেক গাঁয়ের লোক।
খ্যাকশিয়ালীর নিত্যদিন ভাই
গরীব মারার ঝোঁক ॥

পান্না ॥ বটে বটে। জব্বর গান বেঁধেছে মাইরী। নে, আর আছে ?

লোকটি ॥ আছে। তবে আমার সাহস হচ্ছেনা।

পান্না ॥ এই ভয়ের বেটা। কিসের ভয়রে শালা! ভয়, না আমার নামে গান বেঁধেছে বলে হিংসে হচ্ছে ?

লোকটি ॥ শুধু তোমার নামে কিগো...।

পান্না ॥ নয়তো কি তোর বাপের নামে গান বাঁধবে শুয়ার ?

লোকটি ॥ খগেনবাবু, নিধিরাম খুড়ো, দুর্যোধনকা, এমনকি ছিদেম পুরুতের নামেও গান বেঁধেছে গো।

পান্না ॥ বলিস কিরে। সকলকার নামেই বেধেছে! হাঃ হাঃ হাঃ। শালারা সব সময় এমন করবে যেন ভিজে বেড়ালটি! তা আমাকে তো ব্যাটারা

খ্যাকশিয়াল করেছে, ভবের বোধহয় ছুচো, চামচিকে এমনি সব করেছে, কি বলিস ?

লোকটি ॥ তা নয়। তবে ছিদেমের নাম দিয়েছে বোপার গাধা।

পান্না ॥ গাধা! আঃ হাঃ হাঃ। পণ্ডিত হলো কিনা গাধা! বাবাঃ, ছোট লোকগুলোর বিবেচনা আছে তাহলে। [ভাবান্তর] তা হ্যারে, এসব গান লিখেছে কে !

লোকটি ॥ [বিপদ বুঝে] ঠিক জানিনা। মাইরী বলছি।

পান্না ॥ [ধমক] চুপ! রাত দুপুরে আমাটায় টেনে এনে আমার নামে লেখা গান শোনাতে পারো আর সে গান কে লিখেছে তা জানোনা ? বজ্জাৎ !

লোকটি ॥ [বিপন্ন গলায়] সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো।

পান্না ॥ তুই নিজে লিখিস নি তো ? কিরে ? ভালো চাসতো কবুল কর।

লোকটি ॥ বিশ্বাস করো। সবাই তাই সন্দ করছে।

পান্না ॥ সবাই! তার মানে কি! কে সবাই ?

লোকটি ॥ মানে যাদের যাদের নামে গান বাঁধা হয়েছে তারা।

পান্না ॥ তাদের কোথায় পেলি শুনি ?

লোকটি ॥ পাইনি। তারাই আমায় খুঁজছে।

পান্না ॥ তোকে খুঁজছে। কেনো, তুই কি নব কার্ত্তিক যে তোকে খুঁজছে।

লোকটি ॥ না মানে, গানটা কে লিখেছে যদি সে খবরটা দিতে পারি।

পান্না ॥ তুই বলে দিয়েছিস ? আচ্ছা, তাদের কোথায় পেলি বলতো ?

লোকটি ॥ পাইনি। তবে দেখা হয়ে গেছে। তারাই তো বললো তোমাকে দরকার !

পান্না ॥ আমাকে ? কেনো, আমি কি তাদের দালালি নিইচি ?

লোকটি ॥ বললো তোমার পরামর্শ চাই। তাই মিটিং করবে।

পান্না ॥ মিটিং! কিসের মিটিং ?

লোকটি ॥ [ঘাবড়ে] তাতো জানিনে। বললো, আমরা সব পাকুড়তলায় যাচ্ছি, সাপ্‌ুই মশায়কে একটা খবর দিয়ে দিস।

[হঠাৎ কোলাহলের শব্দ। সাপ্‌ুই ব্যস্তভাবে]

পান্না ॥ এই, টর্চটা ধরতো।

লোকটি ॥ [টর্চ দিয়ে চারদিকটা দেখে]

পান্না ॥ ভাগ্যিস খবরটা যে তোমার এতক্ষণ বাদে মনে হলো ?

লোকটি ॥ বারে। সেই থেকেতো গান নিয়েই পড়লে। বলবো কখন শুনি !

পান্না ॥ এই বজ্জাৎ, মাঝরাতে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস !

লোকটি ॥ ভয় কেনো গো। এইতো আলো জ্বলছে। আমি রইচি।

পান্না ॥ বন্ধ কর আলো ! চামচিকে, ও আলো আমার মুখে না ফেলে তোর সাউড়ির মুখে গিয়ে ফ্যালগে যা।

লোকটি ॥ কত্তা।

পান্না ॥ ফের যদি কত্তা বলবি তো তোর জিব টেনে নেবো। মাঝরাতে পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কঁচি পাঠার মতো কত্তা কত্তা বলে লোককে জানান দিতে চাও হারামজাদা !

লোকটি ॥ অপরাধ নিওনিগো। গরীবের অভ্যাসতো, সহজে যায়না।

পান্না ॥ [ধাতস্থ হয়ে] যাক, তবু এই হুঁসটুকু এখনো আছে। তা জারে, সাত গায়ের মানুষ আর কজনাকে কত্তা বলে ?

লোকটি ॥ [বিগলিত ভঙ্গিতে] সে কেবল আপনি কত্তা।

পান্না ॥ সেটা যখন জানা আছে তখন অমন কত্তা কত্তা করে বিপদ ডাকছো কেন মানিক ? কত কষ্টে গান শোনার জন্য লুকিয়ে এই আঘাটায়, আসা, তা তুমি জানো না মীরজাফর ?

লোকটি ॥ [স্বগত] মীরজাফর ? ব্যাটা টের পেলো নাকি ? [ব্যাপারটা আন্দাজ করার জন্য] তা মীরজাফর বলাটা কি উচিত হলো কত্তা।

পান্না ॥ কেনো নয় ?

লোকটি। এই যে এমন আঘাটায় আমি আপনাকে পাহারা দিচ্ছি এটা কি মীরজাফরের কাজ ?

পান্না ॥ ওঃ। বেশ বেশ, তুই মীরমদন। কিরে এবারে খুশিতো ? [বলে পায়চারি করে] কিরে সাড়া দিচ্ছিস না ? [ইতিমধ্যে লোকটা দৃশ্যের বাইরে চলে গেছে] মীরজাফর, এই মীরজাফর। এই !

[দৃশ্যে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে খগেন ঢোকে]

খগেন ॥ কি ব্যাপার হে ? বলি যাত্রার পার্টি সরগর করছো বলে মনে হয়।

পান্না ॥ আহা, কি আমার রসিকতা। বলি একা একা আর কতক্ষণ শান্তি পাবো বলতে পারো ?

খগেন ॥ তা এবারে তো দোকা হওয়া গেল।

পান্না ॥ তোমার নাকি এদানিং খুব ঝামেলা চলেছে ?

খগেন ॥ [প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য] যাক মাতালটা তাহলে তোমায় খবর দিয়েছে।

পান্না ॥ মাতাল ! কি বলছো ?

খগেন ॥ আরে যে তোমায় খবর দিয়েছে। কি যেন নামটা ?

পান্না ॥ সে দিব্যি আমার নামে বাঁধা গান শুনিয়ে দিল। মাতাল হতে যাবে কেন ?

খগেন ॥ এইরে ! ব্যাটা মাতাল তস্য মাতাল। তাইতো তোমায় খবর দেওয়ার কথাটা ওকে বলে দিলাম। যদি আখেরে বিপদ ঘটে তাহলে মাতালের দোহাই দেওয়া যাবে।

পান্না ॥ থামো, থামো... [দৃশ্যে নিধিরাম এবং দুর্যোধন ঢোকে]

নিধিরাম ॥ যাক, খবর পেয়েছো। লোকটা খাঁটি। কিন্তু...

দুর্যোধন ॥ আচ্ছা হারামজাদার নামটা কি যেন।

পান্না ॥ কি গেরো। চার চার জন মানুষ, একটা ছুঁচোর নাম মনে আনতে পারছিনা !

নিধিরাম ॥ বুঝলে, ছোটলোকগুলো সব একরকম দেখতে। ব্যাটাদের আলাদা আলাদা করে মনে রাখা মুশকিল। তা ওসব ছাড়ান দাও। কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।

পান্না ॥ যা বলো, ও গানটা পুরো শুনিয়েছে। বেড়ে বেঁধেছে গানখানা।

দুর্যোধন ॥ ঐ গান এবারে পেরানডা নেবে। নিজের গ্রাম, তবু ঐ গানের ভয়ে রাতদুপুরে পা টিপে টিপে, চাদর মুড়ি দিয়ে আসতে হয় !

নিধিরাম ॥ ছিদেম, পণ্ডিতটা এসে গেলেই সভা আরম্ভ করা যায়।

পান্না ॥ ছিদেম ! বলি ঐ অপোগণ্ডটাকে দলে ভেড়ালে কেন ! শোনো ঐ পণ্ডিতশালাকে আমার বিশ্বাস হয়না।

দুর্যোধন ॥ বিশ্বাস করার দরকারটা কী ? শুধু গোপনে পালপাড়া থেকে খবরটা আনার জন্য ওকে দলে টানা।

পান্না ॥ কি খবর আনবে শুনি ?

দুর্যোধন ॥ খবর আনবে, পালেরা এবারে কখানা মূর্তি গড়েছে, আর সে মূর্তি কার কার ? [হঠাৎ একটা হাঁচির শব্দ হতে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে]

সবাই ॥ [একযোগে] কে, কে ওখানে [এক সঙ্গে সবকটি টর্চ জ্বলে ওঠে]

পান্না ।। কিসের কথা বলছিস ?

দুর্যোধন ।। [অবাক হয়ে] হাঁচির শব্দ শুনতে পাওনি ?

পান্না ।। হাঁচি !! কৈ নাতো ?

নিধিরাম ।। পরিষ্কার শব্দ হল।

পান্না ।। তা হাঁচিটা বেটা ছেলের না মেয়েছেলের ?

নিধিরাম ।। হাঁচি হাঁচি। তার আবার বেটাছেলে মেয়েছেলে কি শুনি !

পান্না ।। আছে, আছে। হাঁচিরও মেয়ে-পুরুষ হয়। হাঁদা নিধিরাম, গেলবারে ঐ পাকুড় গাছে একটা মেয়েছেলে গলায় দড়ি দিয়েছিল কিনা ?

অন্য সবাই ।। [সমস্বরে] তাইতো! [ব্যস্ত পায়ে ছিদাম পণ্ডিত ঢোকে]

ছিদাম ।। সর্বনাশ হয়ে গেছে !

পান্না ।। একি বার্তা আনিলে ঠাকুর।

ছিদাম ।। এটা রসিকতার সময় নয়।

দুর্যোধন ।। আঃ তুমি থামবে ! বলো পণ্ডিত কি হয়েছে।

অন্যরা ।। [সমস্বরে] কি ব্যাপার ?

ছিদাম ।। ওদিকটাতে—আমি স্পষ্ট দেখলাম কে একটা লোক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। কাছে আসতে না আসতেই...।

দুর্যোধন ।। বটে, চলোতো দেখে আসি....।

ছিদাম ।। কি দেখবেন ? সেকি আছে ! একেবারে হঠাৎ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

দুর্যোধন ।। ভূত বলছো !

ছিদাম ।। না...মানে....বাতাসে...।

পান্না ।। বাতাসে মিলিয়ে গেল ! তা যাক। ভূতের জন্য ওঝাই যথেষ্ট। কিন্তু সাতগাঁয়ের হাড়বজ্জাৎ গরীবগুলোর ওঝা পাওয়া মুশকিল। বলি তাদের কাউকে দেখোনিতো ?

ছিদাম ।। না, না। ছোটলোকগুলোকে আমি একক্রোশ দূর থেকে চিনতে পারি !

পান্না ।। [রহস্য করে] পারো ? বাঃ তোমার ভবিষ্যত তো পাকা হে।

দুর্যোধন ।। এবারে আসল খবরটা বলো পণ্ডিত।

ছিদাম ।। পালেরা এবারে চারখানা মূর্তি গড়েছে।

নিধিরাম ॥ চারখানা। দাঁড়াও [নিজেকে বাদ দিয়ে গুনতে থাকে] এক, দুই, তিন, চার। বাঃ আমরাও চারজন।

পান্না ॥ চারজন। কৈ দেখিতো [একই ভাবে নিজেকে বাদ দিয়ে গোনে] এক, দুই, তিন, চার! আরে তাইতো হে!

দুর্যোধন ॥ দাঁড়াও। [নিজেকে ধরে] এক, দুই তিন, চার, পাঁচ। একি একটি যে বেড়ে গেল!

পান্না ॥ বাযদোবাজী! বেড়ে গেল মানে! ফের গোনো।

সবাই একসঙ্গে ॥ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।

পান্না ॥ সর্বনাশ। এযে চারও হয়, পাঁচও হয়!

দুর্যোধন ॥ আবার দেখছি। কেউ নড়বে না। এক, দুই, তিন, চার, আর আমাকে নিয়ে পাঁচ।

অন্যরা একযোগে ॥ ঠিক পাঁচ তো?

দুর্যোধন ॥ হ্যাঁ পাঁচ।

পান্না ॥ [চিন্তিত ভাবে] মূর্তি হলো চারখানা, অথচ আমরা কিনা পাঁচজনা! তার মানে আমাদের মধ্যে এমন একজন আছে পালের যার মূর্তি এখানে পড়েনি!

দুর্যোধন ॥ তাইতো দাঁড়ায়।

পান্না ॥ অথচ আমরা এই মাঝরাতে যার আখাটায় জড়ো হয়েছি সেই পাঁচ জনাকে ছোটলোক ব্যাটারা তাড়বেনা।

খগেন ॥ তাতাড়া ভুজঙ্গ রয়েছে। মোট হলো কিনা ছয়জন।

পান্না ॥ ঠিক বলেছো। সব মিলিয়ে ছয়জন। অথচ মূর্তি হলো চারখানা! [বেশ গম্ভীর ভাবে] তা হলে আমাদের মধ্যে কে কে রেহাই পাচ্ছে! ভুজঙ্গ নিশ্চয় নয়।

দুর্যোধন ॥ না। সে সম্ভাবনা নেই।

পান্না ॥ তাহলে?

নিধিরাম ॥ বোধ হয় আমাকে।

পান্না ॥ কেনো? হঠাৎ এত লোক থাকতে তুমি কেনো? তুমি কি ধোওয়া তুলসী পাতা বলতে চাও।

নিধিরাম ॥ আমাকে এ ভাবে…।

পান্না ॥ কি ভাবে? তুমি বাহাদুরী মেরে বলবে তোমার কোন দোষ নেই

তবু চুপ থাকতে হবে ? কিন্তু সত্যি সত্যিই আমাদের মধ্যে কেউ একজন আছে যাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে !

নিধিরাম ॥ সে যেই হোক নিশ্চয় পান্না সাঁপুই নয়।

পান্না ॥ তা তুমি নিধিরাম মণ্ডল হলে কিনা সাধু ! যেখান দোকান খুলে মিথ্যি ছড়াতে লুটছো। গাঁয়ের লোক বলে আদ্ধেক মাল তুমি সহরেই লরি থেকে বেচে দিয়ে আসো। সেই তোমাকে ওরা ছাড়বে বলতে চাও ?

নিধিরাম ॥ সাঁপুই মশায় শান্ত হন। এখন আমাদের ঘোর বিপদ। এখন কি নিজেদের মধ্যে এমন কাদা ছোড়াছুড়ি করা উচিত।

পান্না ॥ তুমি থামো। এর একটা এসপার-ওস্পার হওয়া দরকার।

দুর্যোধন ॥ কিসের ?

পান্না ॥ ঐযে, মূর্তি হলো চারখানা, মানুষ হলো তরজনা।

দুর্যোধন ॥ মনে হয় ওরা আমাকে ঘাঁটাবেনা।

পান্না ॥ কে আমার পীর এলোরে। কেন ঘাঁটাবেনা ?

দুর্যোধন ॥ আমি তল্লাটে একমাত্র হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। ছোটলোকগুলোকে কম পয়সায় ওষুধ দিতে হবেনা !

পান্না ॥ তবেই চিনেছো ওদের। ওরা সামনে বলবে কত্তা। পেছনে ডাকবে কুত্তা।

খগেন ॥ তাছাড়া ইদানীং পরিবার পরিকল্পনা করানোর নামে তুমি যে কামাচ্ছো সেটা ওরা জানে।

দুর্যোধন ॥ আরে তবুতো আমি পুরিয়া বেধে কিছু দেই, কিন্তু তুমি খগেন ?

খগেন ॥ আমি সরকারী আমলা। মৎস্য বিভাগের কর্মচারী। সাতারটা একটু ভালোই জানি দাদা।

পান্না ॥ আঃ বড় শান্তি পেলাম। বড্ড সুখবোধ হচ্ছে গো। হঠাৎ একেবারে চমকে গিয়েছিলাম। কোথা থেকে এক পেল্লাদ ঢুকে পরলো এই ভেবে সারা হচ্ছিলাম ! এতক্ষণ যা কথা চালাচালি হলো, তাতে সুখের কথাটা এই যে এখনো কোন পেল্লাদ ঢুকে পরতে পারেনি।

নিধিরাম ॥ আরে, ওদের সঙ্‌তো একদিন। বচ্ছরের বাকি তিনশো চৌষট্টি দিনতো আমাদের, তবে ?

পান্না ॥ কথাটা কি ঠিক হলো হে নিধিরাম ? ভাবনা করতেই হয়। কারণ

ওদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার লোক আছে। গাঁয়ের বেশির ভাগ জোয়ানমদ্দ'গুলো ওদের দিকে। তাছাড়া ওরা দলে ভারী, গুনতিতে অসংখ্য।

দুর্যোধন ॥ দলে ভারী বলে ওদের ভয় করতে হবে!

পান্না ॥ বাহাদুরী রাখো। ওদের ছাড়া যে আমাদের একদিনও চলবার নয় এটা যদি ব্যাটারা এক সঙ্গে ভাবতে আরম্ভ করে তাহলে কি হবে বুঝতে পারছো গঙ্গারাম?

অন্য সবাই ॥ তাহলে উপায়?

পান্না ॥ সেই উপায়টা খুঁজে পাওয়ার জন্যেই এমন মাঝরাতে মিটিং। ছোটলোকগুলো সঙ্ঘকে ঘিরে একজোট হয়। আর সেই সঙ্ঘ জমে পালেদের গড়া মূর্তিকে সামনে রেখে। কি তাইতো?

দুর্যোধন ॥ মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে গুঁড়িয়ে ফেলো।

পান্না ॥ চুপ। বেশী বাহাদুরী ফোটাবেনা বলছি। বাতাসেরও কান আছে। ওসব তাড়াতাড়িতে বিপদ আছে। এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে সঙ্ঘ না জমে।

খগেন ॥ বেশতো, তা সেটা কি?

নিধিরাম ॥ আর ভাবতে পারছিনা মোড়ল।

পান্না ॥ মাথা ঠাণ্ডা রাখো বাছা। ব্যাপারটা গোপন। বলা যায়না বাবা পালা দেখছে তাদের মধ্যেও ওদের লোক থাকতে পারে। কাজেই...।

খগেন ॥ মোক্ষম কথা বলেছো মাইরী। আজকাল আবার ছোটলোকের পালায় খুব চল হয়েছে গো।

পান্না ॥ ঘোর কলি। আরো কত কি হবে। তা একটু কাছে এসো বাপধনেরা [প্রত্যেককে ইসারা করে]

[প্রত্যেকে মহাব্যস্ততায় পান্নার পাশে গিয়ে ভিড় করে। পান্না ফিসফিস করে কিছু বলে]

দুর্যোধন ॥ কাজটা কঠিন।

খগেন ॥ যদি বিপদ হয়।

ছিদাম ॥ মানে যদি কোন অমঙ্গল—

নিধিরাম ॥ তাছাড়া থানা পুলিশ।

পান্না ॥ সে ভার আমার।

খগেন ॥ তাহলে সভা ভঙ্গ তো।

পান্না ॥ ভঙ্গনয়, সভা শেষ। এবারে দেখবো ছোটলোকগুলোর কত তেজ। ব্যাটারা বড্ড বেড়েছে। কথায় কথায় বলে অত্যাচারী, শোষক, বলে সমাজের শত্রু। [হঠাৎ চিৎকার শব্দ ওঠে]

সবাই ॥ [সমস্বরে] কে? কে, কে ওখানে!

[নেপথ্যে নাকি সুরে: "আমি পাকুড়তলার ভূত।"]

পান্না ॥ কি! কি বললে! ভূ-ভূ-উ-উ-ত—

সবাই ॥ ওরে, বাবারে, ওরে—কে আছিসরে— [চিৎকার করতে করতে প্রস্থান]

একজন ছদ্মবেশী দৃশ্যে ঢোকে এবং নেচে নেচে গান ধরে:

আমি পাকুড়তলার ভূত।
আমি ভাঙবো হাড়ি—অত্যাচারীর,
যারা আসলে যোমদূত॥
জেগে থাকো সকল পাড়া
বুঝে নাও গো মোর ইসারা,
শোভন আলী দিচ্ছে তালি,
সাত গাঁয়ের এক পুত॥

[দৃশ্যে অন্ধকার নেমে আসে। সামান্য সময় অতিবাহিত হয়। দৃশ্যে আলো ফিরে আসে। সময় পরের দিন। স্থান, সেই একই পাকুড়তলা। নেপথ্যে জনকোলাহল শোনা যায়। দৃশ্যের এদিক থেকে ওদিক মানুষেরা ফুর্তিতে হেঁটে যায়। মেলায় বাঁশি বাজে। শব্দ ওঠে। পরনে ছেঁড়া ধুতি, গায়ে ফতুয়া মাথায় লালটুপি হারাধনকে হুড়মুড় করে দৃশ্যে ঢুকতে দেখা যায়। তার পেছন পেছন হারাধনের স্ত্রী পদ্মবৌ।]

পদ্ম ॥ [হারাধনের মাথা থেকে টুপিটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, না পেয়ে।] আমার কপাল পুড়লো গো। আমার সর্বনাশ হল গো। বলি কে কোথায় আছো গো ও-ও-।

হারাধন ॥ বলি এই, হচ্ছেটা কি। আমি কি চিতেয় উঠেছি যে কাঁদতে লেগেছিস?

পদ্ম ॥ কাঁদবো না? বলি সঙ, সাজবার আর কিছু ছিল না তোমার?

যেচে যেচে আমার সঙ্গে শত্রুতা ?

হারাধন ॥ শত্রুতার ভয় তোর ? না সহবের ?

পদ্ম ॥ সে একই কথা। তুমি আমার মাথা খাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।
ঐ অলক্ষুণে সঙ্ তুমি সেজো না গো !

হারাধন ॥ [টুপিটা ঠিক করতে করতে] সঙ্ বলতে সঙ্। সাক্ষাৎ যোমদূতের সঙ্। তুই দেখে নিস্, এবারে মালোপাড়ার সঙ্‌কে পথে বসিয়ে ছাড়বো। আমার নাম হারাধন পণ্ডিত।

পদ্ম ॥ [সহজে রাজী করানো গেল না বুঝে] আহা কি সুবোধ। এত কিছু থাকতে সাজলে কিনা পুলিশ ! মালোপাড়ার সঙে সেবারে কেমন শিব সেজেছিল।

হারাধন ॥ [নাটুকে গলায়] সাবধান পদ্মরাণী। হতে পারো তুমি আমার বে করা বৌ, তাই বলে শিব সাজবো কি বাঁদর সাজবো তা তুমি বলার কে ?

পদ্ম ॥ তুমি তাহলে পুলিশ সাজবেই ?

হারাধন ॥ [অসন্তোষ ভঙ্গিতে] কি মেয়েছেলে দেখো ! বলি সোয়ামী চোর সাজলে বোধহয় মান বাড়বে তোর।

পদ্ম ॥ সে-ও ভাল।

হারাধন ॥ আমবি তুই বৌ ; সঙ্ দেখতে আসা লোকজনেরা ভাবছে তুই আমার পরিবার নোস ! তারা ভাবছে, আমি বোধহয় ভুজঙ্গ দারোগা।

পদ্ম ॥ দারোগা মিনসের মুয়ে আগুন।

হারাধন ॥ তবে ? [স্নেহের সুরে] তোর কিসের এত ভয়রে পদ্ম। আমিতো তোকে কিছু বলিনি বৌ ! একবারও তোকে দোষ দেইনি !

পদ্ম ॥ [কান্নায় বুঁজে আসা গলায়] একবার মনে লয় সব কিছু বলে বুকখানা হালকা করি। বলি কতবড় পাষণ্ড সে। বলি গরীব ঘরের বৌ ঝি দেখলে কেমন ফন্দি আঁটে জানোয়ারটা। কিন্তু...কিন্তু .. ভয় হয়।

হারাধন ॥ কিসের এত ভয়। আমাকে ?

পদ্ম ॥ [হারাকে জড়িয়ে ধরে] নাগো না। ভয় হয়···সঙ্‌তো বছরে একদিন। বাকি দিনগুলো তো সেই একই রকম। ঐ পথ দিয়ে তোমার আমার যাওয়া আসা, যদি জানোয়ারটা···।

হারাধন ॥ তা একটা দিনকেই বা হাতছাড়া করবো কেন বল ! যতটুকু পাকি

ততটুকু হাসি মস্করা করবো। [গলার সুরে মমতা] তা বাদে একার. লজ্জা দশজনার মধ্যে ভাগ করে দিলে—তোর বুকখানা হাল্কা হবে কে. রে বৌ!

হারাধন ॥ [পদ্মর থুতনি নেড়ে] কি, হবে না পদ্মরাণী?

[এই রকম কোন মুহূর্তে সাতগাঁয়ের যোয়ান মরদদের একজন—শিবু, ঢোকে।]

শিবু ॥ বাঃ বাঃ। এযে একেবারে যুগল মিলন। দুটিতে এবারে দেখছি· মোক্ষম সঙ্ নামিয়েছো হারাদা।

পদ্ম ॥ [খুশিতে কপট রাগ] এ আমাদের মাগ-ভাতারের ব্যাপার। তোমার· কি গো শিবঠাকুরপো?

হারাধন ॥ যা বলেছিস বৌ। এ হলো গিয়ে পন্ডিত কোম্পানীর পেরাইভেট্ গলি।

শিবু ॥ দূর থেকে ভাবলুম কেউ বোধহয় কেষ্টযাত্রার সঙ্ নামিয়েছে। তা কলির কেষ্টদা—মাথায় লালটুপি যে বড়!

পদ্ম ॥ ঐ টুপিই আমার সব্বোনাশ করবে।

হারাধন ॥ বক্ বক্ করিসনে বৌ। আমাদের পাড়ার সব্বাই আসুক। আসুক সাতগাঁয়ের মানুষজনেরা। সবাইকে সর্বনাশা জানোয়ারটার বিত্তান্ত বলবো।

শিবু ॥ [কিছু একটা আন্দাজ করে] টুপিতে সর্বনাশের বিত্তান্ত! না, এবারে সঙ্ জমবে ভালো।

পদ্ম ॥ দেখ শিবঠাকুরপো, তোমরা হলে আমাদের আপনজন। তুমিই বিচার· করো। খামোকা ভুজঙ্গ দারোগার সঙ্ করে কি হবে? গরীব মানুষ আমরা....।

শিবু ॥ গরীব বলেই তো সোজা কথা সোজা বলার পথ নেই। গরীব বলেই তো হক কথা সঙের ভেতর দিয়ে বলার চেষ্টা পদ্মবৌ। তাছাড়া হারাদা সাতগাঁয়ের ছেলে। তারে তোমার বিশ্বাস হয় না!

পদ্ম ॥ হয়। কিন্তু ভয় যে....।

শিবু ॥ ভয় কার নেই? তুমি কি বলতে চাও ভুজঙ্গ দারোগা কাউকে ভয় করে না? তারও নিজের মতো ভয় আছে। সংসার থাকবে, মানুষ· থাকবে। আর ভয় থাকবে না?

পদ্ম ॥ জানি সব জানি। তবু মন মানে না যে।

হারাধন ॥ বছরকার দিন আজ। সাতগাঁয়ের একটা নিজের দিন। আজকের দিনটায় তোর আমার আলাদা করে কিছু নেই।

হারাধন ॥ তাছাড়া দশজন যখন জেনেছে, বিত্তান্তটা লুকিয়ে কি লাভ? আমি দারোগা সাজবোই পদ্ম।

শিবু ॥ বেত্তান্ত!

পদ্ম ॥ হ্যাঁ সে বেত্তান্ত সকলকার জানা দরকার। গরীব ঘরের বৌ-ঝি বলে তার মান-সম্মান থাকবে না! আমি নিজে বলবো—দশজনারে জিজ্ঞেস করবো—কেন কি অপরাধে তোর হাতে ভুজঙ্গ দারোগা আমায়—। [হঠাৎ থেমে যায়]

শিবু ॥ পদ্ম বৌ। পদ্ম বৌ! ও হারাদা?

হারাধন ॥ আজ সন্ধে নামবে। তাই তোরবাতে পদ্ম বের হয়েছিল ফুল তুলতে। নিজের গাঁ। চেনা জায়গা। তাই...।

পদ্ম ॥ সবে দাওয়া ছেড়ে পুকুর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—ওমা দেখি কি না, চার চারটে মানুষ, কাপড় দিয়ে তাদের মুখগুলো ঢাকা, মড়া কাঁধে ছুটছে। পেছন পেছন ভুজঙ্গ। মড়া নে ছুটছে অথচ হরি বল দেয় না। গায়ে কাঁটা দে উঠলো আমার। বিশ্বাস করো ভূতপ্রেত ভেবে ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই—বাঘের মতো ভুজঙ্গ দারোগা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পরলো।

হারাধন ॥ মড়া নিয়ে চারজন তখন দৌড়চ্ছে। আর ভুজঙ্গ বলছে তোরা ছোট, আমি সামলাচ্ছি। [সময় নেয়] তারপর সামলালো। পদ্মর গায়ে হাত দিয়ে বললো—মাগী, ভোর রাতে চুরি করতে বেড়িয়েছিস। চল থানায়।

পদ্ম ॥ ভয়ে দেমার—আমার কান্না পেল। আমি আর কোন শব্দ না করেই মাটিতে আছড়ে পড়লাম। [কাঁদতে থাকে]

শিবু ॥ থামো থামো পদ্ম বৌ।

হারাধন ॥ এবারে বল শিবু....।

শিবু ॥ এবারে ভুজঙ্গর সর্ব্বনাশ হবে। দশজনাকে জানাতেই হবে কত বড় পাষণ্ড সে। কিন্তু হারাদা, ভোর বেলায় মড়া কাঁধে চার জন। হরি বোল দিচ্ছে না! তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে ভুজঙ্গ! এ যে

মহা ধাঁধা। সাতগাঁয়ের কেউ গেল অথচ কেউ জানলো না।
মুখগুলো কাপড় দিয়ে বাঁধা।

হারাধন ॥ সেই রহস্যই জানতে হবে। গোটা সাতগাঁয়ের মানুষ জড়ো হলে
তাদেরই শুধোবো।

[ব্যস্তভাবে দৃশ্যে সাতগাঁয়ের অপর জোয়ান মধু প্রবেশ করে]

মধু ॥ তোমরা এখানে গল্প করছো। শিবে তুই বসে না থেকে—যারা
মেলায় আসছে তাদের খবরটা আগাম দিয়ে রাখবি।

শিবু ॥ খবর! কিসের খবর রে মধু?

মধু ॥ এবারে সঙ্ হবে না।

হারাধন ও শিবু ॥ সঙ্ হবে না!

শিবু ॥ হবে না মানে? কেন সঙ্ নামাতে কি রাজধানীর হুকুম আনতে হবে
বলতে চাস!

হারাধন ॥ তুই থামতো শিবে। হবে না মানে—সঙ্ সব এলো বলে।

মধু ॥ [ভুল বুঝতে পেরে] আহা সে কথা হচ্ছে না। আমি বলতে এসেছি
এবারে পালপাড়ার সঙ্ নামবে না।

শিবু ॥ কেনো? পালেদের এত গোমড় কিসে?

হারাধন ॥ তাছাড়া পালপাড়া নিজে থেকে ঠিক করবার কে? হবে কি হবে
না তা ঠিক করবে সাতগাঁয়ের মানুষজন।

মধু ॥ আহা কথাটা বুঝবিতো আগে!

শিবু ॥ বেশ সব খুলে বল।

মধু ॥ শেষ রাতে জনাকয়েক লোক লাঠিসোটা নিয়ে পালপাড়ায় ঢুকে,
এবারকার সঙ্-এর মূর্তি চারখানা তুলে নিয়ে গেছে।

শিবু ॥ কি গাঁজাখুরি গল্প বলছিস রে মধু। লাঠিসোটা নিয়ে মাটির মূর্তি
লুটতে এলো ডাকাত! বলি পালেদের সঙ্গে কারো ঝগড়া আছে কি?

মধু ॥ তাইতো সবাই বলছে।

হারাধন ॥ তা না হলে এমন কাণ্ড হয়।

মধু ॥ লোকগুলো এসেছিল কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে। যাওয়ার সময় বলে
গেছে ফের সঙ্-এর মূর্তি গড়লে ভালো হবে না।

শিবু ॥ গায়ের জোর! সাতগাঁয়ের মানুষ এখনো মরে যায়নি।
কেবল বুঝতে চাইছি সঙ্ বন্ধ করে কাদের লাভ?

মধু ॥ পালেরা রাগে দুঃখে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। পালপাড়ার আজ অরন্ধন।

শিবু ॥ সেকি! পরবের দিন অরন্ধন! চলতো মধু ।

মধু ॥ বুড়ো সুজন কর্তার সে কি কান্না! বলে সাতগাঁয়ের পরবে পালপাড়ার মূর্তি থাকবে না, এ যে ঘোর পাপ!

হারাধন ॥ তা তোরা কি বললি ?

মধু ॥ আরে মাতব্বরেরা সবাইতো সেখানে। আশু জ্যেঠা, শ্রীধর খুড়ো, ফকির মোল্লা, সবাই।

শিবু ॥ তাই বল। সাতগাঁয়ের মানুষ বলে কথা। আমরা এগোচ্ছি গো হারাদা। তোমরা দুটিতে ততক্ষণ পাকুড়তলা আগলাও। আজ পরবের দিন। সঙ্ নামবেই হারাদা। [শিবু ও মধুর প্রস্থান]

হারাধন ॥ পদ্ম, খেয়াল করলি!

পদ্ম ॥ কি ?

হারাধন ॥ আরে এমন একটা ব্যাপার অথচ পান্না সাঁপুই সেখেনে হাজির নেই।

পদ্ম ॥ কি বলতে চাও ?

হারাধন ॥ না, মাতব্বরী করার এমন একটা সুযোগ, তবু কিনা পান্না সাঁপুই নেই। ভাবনার কথা রে বৌ।

[নেপথ্যে ঢোল সহরতের শব্দ শোনা যায়। পদ্ম উঠে গিয়ে শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে থাকে]

পদ্ম ॥ চাষাপাড়ার সঙ্ নেমেছে।

[দু-একজন দর্শক দৃশ্যে ঢোকে এবং বের হয়ে যায়]

হারাধন ॥ [দর্শককে লক্ষ্য করে] কি বছর সঙ্ নামানোর বহু আগে থাকতেই পাড়ায় পাড়ায় শলা পরামর্শ চলে। পাড়ার লোক বসে ঠিক করে সেবারে কোন সঙ্ নামবে। সেই মতো পালেরা বেছে বেছে খানকয় মূর্তি বানায়। পালপাড়ার আলাদা কোন সঙ্ নেই। ঐ মূর্তি নিয়ে পালেরা আর সবার সঙ্গে পাকুড়তলায় এসে জোটে। এই হয়। সাতগাঁয়ের পরবের এটাই নিয়ম।

[চাষাপাড়ার সঙের দল দৃশ্যে ঢোকে। হারা, পদ্ম এরা বসে পড়ে। গান আরম্ভ হয়, সঙ্গে নাচ]

॥ গান ॥

মাটি মোদের মা,
ও রাম ও রহিম ভাইরে,
সেই মারে ছেড়ে মোরা,
কোথাও যাবো না ॥
জমিদার আর মহাজনে,
লাগলে এবার মোদের সনে,
মোরা সইবোনা ভাই,
সইবো না আর,
মা'য়ের মান খোয়াবো না ॥
ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের শিসে,
মোদের রক্ত আর ঘাম,
রয় যে মিশে,
সেই রক্তে রাঙা ফসল, জমির
মোরা হক্ দেবোনা, বোনা ॥

[নাচ গান শেষ হতে সঙ্-এর মানুষজনেরা বসে পড়ে। দৃশ্যে প্রথম দৃশ্যের পান্না সাঁপুই-এর সাজ পোষাকে সজ্জিত এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। হারাধন তাকে দেখে মাথার টুপি ঠিক করে নেয়।]

এক ব্যক্তি ॥ মরবি, সব হারামজাদা মরবি। শাস্ত্রে আছে, পিপড়ের ডানাওঠেং মরিবার তরেং। স্বনামে আর বেনামে মিলিয়ে আধখানা সাতগাঁয়ের মালিক আমি, পান্না সাঁপুই। তোমরা আমার নামে সঙ্ নামাও?

হারাধন ॥ তাইতো', কি সাহস!

এক ব্যক্তি ॥ [হারাধনকে ধমকে] এই! আবার তাল ঠুকছিস। আমি সঙ্ নই। আসল চড়কা মার্কা পান্না সাঁপুই।

হারাধন ॥ ভেজাল প্রমাণে হাজার টাকা পুরস্কার!

একব্যক্তি ॥ পান্না সাঁপুই-এর টাক দেখেছো না?

হারাধন ॥ আহা! সে তো ভেজাল প্রমাণে।

একব্যক্তি ॥ ভেবেছিস দেশে আইন নেই!

হারাধন ॥ আমরা মুখ্যু মানুষ। কি বলতে কি শোনেন।

একব্যক্তি ॥ মুখ্যু! সব সেয়ানা। রক্তের রাঙা ফসল। হক দেবো না।

আদিখ্যেতা আর কাকে বলে! বলি তোরা ছোটলোক। তোরা লেখার কে শুনি? তাছাড়া না লিখি কেড়ে নিতে জানিনা? খালি খালি মন্ত্রী থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত...। কি, দেখতে চাস?

হারাধন ॥ না না। সে ক্ষমতা আপনার আছে কত্তা।

একব্যক্তি ॥ [সন্তুষ্ট হয়ে বসে] তাই বল। এতদিনের শিক্ষা বলে কথা। সে কি চাইলেই ভোলা সম্ভব নাকি!

হারাধন ॥ শিক্ষা ভুলবো মানে! আরে একবার যদি তুমি সাঁতার শিখলে, তা তুমি জল পাও বা না পাও জীবনভোর ভুলবেনা!

একব্যক্তি ॥ এই হলো কথা। সেইতো গিয়ে কেঁদে পরবি। বৌ-এর অসুখ। দানা পানি খেতে পারনা। ঘরে কুটুম এয়েছে, বাপের শ্রাদ্ধ। এই সব জ্বালা পোয়াতে পোয়াতে আমার শরীর আধখানা হওয়ার জোগার!

[এই সংলাপ চলার মাঝখানে একজন হাঁটুঝুলের পাঞ্জাবী আর আলিগড়ি পাজামার সাজা কাঁধে ব্যাগ, দুজে ঢোকে। তার নাম ফকিরচাঁদ]

ফকির ॥ [এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে] কথাটা কি ঠিক হল দাদা ভাই!

একব্যক্তি ॥ ভাই! এযে ওস্তাদ লোক। চেনা নেই জানা নেই, বলে কি না ভাই!!

ফকির ॥ [অবাক হয়ে] একি বলছেন আপনি! আপনি আমায় চেনেন না। আমি হলাম গ্রামসেবক ফকির চাঁদ।

একব্যক্তি ॥ [রহস্য করে] কি বললে? ফিকিরবাজ! তা কোন ফিকিরে এয়েচো বাবা?

ফকির ॥ [তোষামোদের সুরে] আপনি সাতগাঁয়ের মাথা। আপনার কথায় রাগ করা চলেনা। আমি বলছিলাম কি...।

একব্যক্তি ॥ খোলসা করে বলো বাছা।

ফকির ॥ এই সোনার দেশ, সোনার মানুষ। এখানে এমন অসভ্য কথা!

একব্যক্তি ॥ সোনার দেশ! সোনার মানুষ! সবশালা বাঁশের মানুষ। খোঁচা মারার জন্য উঁচিয়ে আছে।

ফকির ॥ ওকথা বলবেন না। আপনি হলেন গিয়ে....।

হারাধন ॥ সুদখোর।

একব্যক্তি ॥ [কপট ধমক] এই হারা, তোর ঐ টুপির ইজ্জৎ নষ্ট করছিস !

ফকির ॥ মানে আপনি হলেন গিয়ে... ।

একব্যক্তি ॥ গ্রামীন ব্যাংক । ধার চাই, বাঁধা রাখো । টাকা নাও সুদ দাও ।

সুদ দিতে না পারলে, ঘুঘুর ফাঁদ দেখো । কি ভুল বললাম ?

ফকির ॥ না, না । হক কথাই বলেছেন । তা বলছিলাম কি ঐ যে

বলছিলেন চাষাভুষোদের জন্যে ভাবতে ভাবতে.... ।

একব্যক্তি ॥ বলিছিতো ! ওদের জন্য ভাবনায় ভাবনায় আমার ঘুম আসেনা ।

হারাধন ॥ মানে যদি লুট হয়ে যায় ।

একব্যক্তি ॥ এই হারা, ফোড়ন কাটছিস ।

ফকির ॥ না । আসলে আমরা এই গ্রামসেবকেরা ওদের কথা ভাবতে

ভাবতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি ।

হারাধন ॥ আগুন ধরবে ভালো !

[এরই মধ্যে ফকির চাঁদ গান ধরে ।]

॥ গান ॥

দশের লাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,

মোদের শরীর হয় যে পাত ।

তবু দশজনা শুধু সন্দ করে,

এমনি মোদের বরাত ॥

একব্যক্তি ॥ বটে । খুব দুঃখের ।

॥ গান ॥

মোরা জনতার সেবা

করিব বলিয়া, যতই কাঁদিয়ে ভাই,

জনতার কাছে মোদের সবার,

তেমন খাতির নাই ॥

[গান শেষ হতে জনতার মধ্যে থেকে কোলাহল শোনা যায় । হঠাৎ পদ্ম বৌ বলে ওঠে]

পদ্ম ॥ এতই যদি দরদ তালে গাঁয়ে ডাক্তার বদ্যি আসে না কেনো ?

একব্যক্তি ॥ একটিন তেল পাওয়া যায় না কেনো ?

হারাধন ॥ ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না কেনো ?

পদ্ম ॥ ইস্কুল ঘরে ছাগল চড়ে কেনো ?

একব্যক্তি ॥ কি ভয়ানক ।

হারাধন ॥ দারোগা পুলিশ জুজুর করে কেনো ? কিগো গ্রামসেবক দাদা, জবাব দাও ।

পদ্ম ॥ সেবক না বক ।

একব্যক্তি ॥ এই, হচ্ছেটা কি হারা । মানী লোকের মান রাখবে না ? এসো হে গ্রামসেবক ভাই তোমাতে আমাতে কোন ঝগড়া নেই । এরা সব চাষাভুষো, একদিনের সঙ করে গোটা বছর কাটাতে চায় । হাভমুখা সব ।

[নেপথ্যে ঢোল সংয়ের শব্দ ওঠে । একব্যক্তি এবং ফকিরচাঁদ জনতার একপাশে গিয়ে বসে । দৃশ্যে সুজনপাল প্রবেশ করে]

সুজন ॥ [নিশ্চিন্ত গলায়] যাক্ সঙ তবে নেমে গেছে । বাঁচা গেল ।

হারাধন ॥ সুজন কাকা, মধু এসেছিল ?

সুজন ॥ এসেছিল । তবু আমিও বের হলাম । পাড়ায় পাড়ায় খবর দিয়ে এলাম । বলে এলাম মূর্তি চুরি গেছে যাক্, পালপাড়ার সঙ নামবে ।

হারাধন ॥ নামবে : [আনন্দে] জয় সাতগাঁয়ের জয় । জয় সাতগাঁয়ের মানুষের জয় ।

সুজন ॥ তোরা আছিস ! সাতগাঁয়ের মানুষজন আছে.... ! কটা চোরের ভয়ে বছরকার পরবে ভাগ নেবো না ?

হারাধন ॥ [এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে]

সুজন ॥ কি করিস, কি করছিস হারা ?

হারাধন ॥ পরবের দিন, একটু পুণ্যি করলাম খুড়ো ।

সুজন ॥ হারা, তোরা চালিয়ে যা । সবাইকে বলবি চোরের ভয়ে মাটিতে ভাত খায় না পালপাড়ার মানুষেরা । বলবি পালপাড়ার সঙ সবার শেষে নামবে । [সুজন দৃশ্য থেকে বের হয়ে যায়]

একব্যক্তি ॥ [হঠাৎ] এতো ঘোর অনিয়ম ।

ফকির ॥ কি হচ্ছে মাইরী ।

একব্যক্তি ॥ ও সব জানি না । পালপাড়ার সঙ কেন শেষে নামবে শুনি ? জবরদস্তি !

হারাধন ॥ [ফকির ও একব্যক্তিকে লক্ষ্য করে] একি । তোমরা ৩টিতে সঙ, অথচ হঠাৎ আসলের মতো ব্যবহার করছো । এমন করলে সঙ জমে ?

যারা সত্যি দেখতে আসবে তারা কি মনে করবে শুনি। ভালো চাওতো চুপচাপ বসে থাকো।

[ওরা দুজনে ফিরে বসে পড়ে। দৃশ্যে ছিদাম পুরুত প্রবেশ করে]

ছিদাম ॥ বাবাঃ। চাঁদের হাট বসেছে যে। তা হারা শুনছি নাকি পালেরা এবারে মূর্তি নামাবে না।

একব্যক্তি ॥ তাতে কি। তুমি মূর্তি সাজবে।

ছিদাম ॥ কি কথার ছিরি। লঘুগুরু ভেদ নেই। হারা, যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে।

হারাধন ॥ বেশ, আজ্ঞা করো।

একব্যক্তি ॥ [ব্যঙ্গ] দেখ ছিদেম পুরুত, আমি থাকতে মেলা গরম দেখিও না।

হারাধন ॥ আবার।

একব্যক্তি ॥ ভুল হয়ে যায়। আসলে পাম্না সাপুই-এর একটো করতে বেজায় আনন্দ হয়।

ছিদাম ॥ বটে। আনন্দ হয়। নকল হবার এই হল ফল। এবারে আসল সাপুই মশায়কে এই খবরটা পৌঁছে দিতে পারলে আমার শান্তি।

হারাধন ॥ তাই বলো। আমাদের পেছনে লাগতি এয়েচো।

ছিদাম ॥ কক্ষনো না। আমি বলতে এসেছি, এই যে পালেরা মূর্তি নামাচ্ছে না, সে ব্যাপারে ব্রাহ্মণের আদেশ নিতে হয় তাঁদের জানা নেই?

হারাধন ॥ তা সে কথা পালেদের না বলে এখানে এসে গরম দিচ্ছো যে বড়?

একব্যক্তি ॥ [স্বগত] ও পালপাড়ায় গেলে সব গুবলেট হবে। পাপের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পালেরা সঙ নামাবেই না। [প্রকাশ্যে] এই হারা, দেখতো ভালো করে। একো মনে হচ্ছে বামুনপাড়ার সঙ।

হারাধন ॥ [ইঙ্গিত বুঝে] আরে। কি আশ্চর্য। অবিকল ছিদাম চক্কোত্তি। টিকিটা পর্যন্ত সেই রকম। কি কাণ্ড মাইরী।

ছিদাম ॥ [রাগে] কি বললি। আমি সঙ। শালা ছোটলোক, তোদের তেল হয়েছে খুব তাই না?

হারাধন ॥ ছিদেমের মতো গাল পর্যন্ত দেয়।

ছিদাম ॥ ব্রহ্মশাপ লাগবে। নির্ঘাৎ ডুববি তোরা। দেশে পুলিশ প্যায়দা আছে। জোতদার জমিদারের অভাব হয়নি। দেখবি, মজা টের পাবি। [রাগে গজগজ করতে করতে দৃশ্যের বাইরে চলে যায়]

[ঢোল সহযোগে বাজে। মালোপাড়ায় সঙ্ ঢুকে প্রবেশ করে। সবাই ঠিকঠাক বসে পড়ে। সঙের নাচ এবং গান আরম্ভ হয়।]

।। গান ।।

ও মন বুনবি কত জাল, ও মন বুনবি কত জাল,

জাল রাজা জাল মন্ত্রী,

তুই তারে কেমনে দিবি সন্ধান ।।

মন, জাল ফেলে যেই মাছ উঠাবি

সামনে সমন দেখতে পাবি,

ও দালাল ফঁড়ে যুক্তি করে,

ও তোরে বানাবে কাঙাল ।।

কলের নৌকায় মাছমারার

এবার।

তোরে ভিটে মাটি করবে ছাড়া,

তাদের মন্ত্রী সাহেব মন্ত্রণা দেয়,

তোর এমনই কপাল—

মন বুনবি কত জাল...... ।।

[গান শেষ হতে খগেন প্রবেশ করে। খগেনকে দেখে জমায়েত একটু সতর্ক হয়ে যায়। তবে সঙ্-এর দিন, তাই মানুষজনদের খুব বিচলিত মনে হয় না।]

খগেন ॥ কালু মালো আছো, তোমাদের মধ্যে কেউ কালু... ।

[জমায়েতের একজন যার নাম রঘু সে জবাব দেয়।]

রঘু ॥ এখানে অনেক কালু, অনেক মালো। তা কজনাকে চাই ?

খগেন ॥ বটে। রসিকতাও চলে তাহলে। তা বেশ। তোমরা নাকি চিংড়ির চাষ করবে না বলেছো ?

রঘু ॥ বলিনি, আমরা ঠিক করেছি।

খগেন ॥ ঠিক করেছো। জানো চিংড়ি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আনে।

রঘু ॥ জানলাম।

খগেন ॥ তাহলে ?

রঘু ॥ আমরা চাষ করবো না। ওতে আমাদের লাভ নেই।

খগেন ॥ লাভ। দেশের লাভটা লাভ নয়। সামান্য ব্যক্তিগত লাভটা বড় হল্লে

উঠবে ?

রঘু ॥ দেশের কিসে ভালো আর কিসে মন্দ তার আমরাও কিছু কিছু বুঝি দাদা।

খগেন ॥ তাহলে আর গোলমালটা কোথায়।

রঘু ॥ বিদেশ যাবে তাই চাহিদা বেশী। তাই যোগান বেশী চাই। সব বেশী। কেবল আমাদের ভাগেরটুকুর বেলায় বরাবর এক। তাই—

খগেন ॥ তাই চিংড়ির চাষ বন্ধ করবে ? কি ভয়ানক।

হারাধন ॥ দেখুন দাদা, আজ পরবের দিন। ও সব কথা অন্যদিন বলতে আসবেন। মানে এখন বিদেয় হোন দাদা...

খগেন ॥ যদি না যাই ?

ফকিরচাঁদ ॥ [বিপদ বুঝে] এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না দাদা। হতে পারেন আপনি সরকারী আপিসের সঙ। তাই বলে ধমক দেবেন ?

খগেন ॥ কি বললে ? কি।

একব্যক্তি ॥ [রহস্য করে] ঐ ঢোলা প্যান্ট দেখেই আমি বুঝেছি এ ব্যাটা সঙ্ না হয়ে যায় না।

খগেন ॥ আবার ইয়ার্কি হচ্ছে।

ফকিরচাঁদ ॥ আপনি সঙ নন ?

খগেন ॥ আলবাৎ না।

হারাধন ॥ বেশতো, দশজনই বলুক আপনি তাহলে কি ?

রঘু ॥ চঙ্ গো, চঙ।

খগেন ॥ কি সাংঘাতিক। অধিকর্তা বললেন কিনা যাও খবর নিয়ে এসো...।

ফকিরচাঁদ ॥ অধিকর্তা না অন্য কোন কর্তা ?

খগেন ॥ কি বলতে চাও ?

রঘু ॥ এমনি দিন যে আপিস যায় না, সে মানুষ যখন সঙে ঢুকে কাজ দেখাতে চায় তখন সন্দ হবে না ?

খগেন ॥ সরকারী কাজের আবার সময় আছে নাকি ?

হারাধন ॥ অত জানি না। তবে এটা সবাই বুঝেছে, আপনি সরকারী দপ্তরের সঙ্।

খগেন ॥ বেশ, এক মাঘে শীত যায় না। [দ্রুত বের হয়ে যায়। সবাই এক সঙ্গে হাত তালি দিয়ে ওঠে। হারাধন উঠে দাঁড়ায়। মুকাভিনয়ের

ভঙ্গিতে মাইক ঠিক করে।]

হারাধন ॥ সঙ্‌ ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে আর কি। বুঝতেই পারছেন। সবই আপনাদের জানা। তা যা বলছিলাম। এর পরেই জোলাপাড়ার সঙ্‌ নামবে। তার আগে একটা কথা জানা দরকার। আপনারা শুনেছেন, এবারে সঙ্‌-এর জন্য পালেরা যে চারখানা মূর্তি তৈরী করেছিল তা চুরি গেছে।

রঘু ॥ হারাদা, ছোট করে বলো মাইরী।

হারাধন ॥ বেশ। সাতগাঁয়ে এ ঘটনা এই প্রথম। কিন্তু কে চুরি করলো ঐ মূর্তিগুলো?

একব্যক্তি ॥ কে আবার? চোরে।

হারাধন ॥ চোর কখনো খড়ের কাঠামো মাটির পলেস্তারার মূর্তি নিতে আসে?

রঘু ॥ বেশ, বাবুপাড়ার সঙ্‌ আসুক। তাদের শুধোবে। বাবুদের যা বুদ্ধি।

একব্যক্তি ॥ আঃ। কি শুনলে তাহলে। শুনলে না, জোলাপাড়ার পর পালপাড়া আসবে।

রঘু ॥ তাইতো।

হারাধন ॥ হাঁ। বাবুপাড়ার সঙ এবারে নামবে না।

রঘু ॥ কেন। বাবুদের এত দেমাক কিসের?

হারাধন ॥ বাবু বলে। বাবুপাড়ার লোকেরা বলেছে যেহেতু এবারের সঙ্‌-এ ঠাকুর দেবতা নেই তাই বিপদ হতে পারে।

একব্যক্তি ॥ তা বাবুরাই ঠাকুর দেবতা সেজে নামতে পারতেন।

হারাধন ॥ সাজবে কিগো। তেনারা তো ঠাকুর দেবতার মতোই এখন।

একব্যক্তি ॥ জব্বর বলেছো মাইরী।

হারাধন ॥ আসলে সঙে আজকাল আর বাবুদের আমোদ হয় না।

[একটু আগেই প্রায় নিঃশব্দে ফকিরচাঁদ বের হয়ে গিয়েছিল। তাকেই ফুলবাবু সেজে দৃশ্যে ঢুকতে দেখা যায়।]

হারাধন ॥ এ আবার কি।

রঘু ॥ আহা, বাবুদের হয়ে সঙ্‌ নিয়েছে আর কি।

হারাধন ॥ বাবুপাড়ার মান রাখতে। তা চালাও খেল।

॥ ফুলবাবুর গান ॥

আসি নাই আমি, আসি নাই ও মি,

এবারে করিয়া গোঁসা।
মোরা কদলি জানিয়া আসিতাম আগে
তোমাদের ভাবি খোসা॥

রঘু ॥ তা খোসায় এবার বুঝি পা হড়কালো ?

॥ গান ॥

মোরা শখের লাগিয়া
চাষি সাজি ভাইরে,
সাজিয়া থাক মজুর॥
তবু প্রাণ পড়ে থাকে,
তোমাদের দিকে—
শুনিতে বাবু, হুজুর॥

রঘু ॥ হুজুরের কি কাণ্ড।

॥ গান ॥

ছোট লোক তোরা,
চাষাভুষো সব
বাড়িয় করিস সঙ,
মানীর গায়ে কাদা ছুঁড়িস,
ঢং করে বলিস, সঙ ॥

হারাধন ॥ সেই দুঃখে এবারে বাবুপাড়ার সঙ নামলো না ?

ফুলবাবু ॥ [ছড়া কাটে।]

শোনরে হারা,
বোঝ ইসারা,
আনরে কাছে কান
জেনে নে রে,
কেনো বন্ধ,
বাবুপাড়ার গান॥
[হারাধন কাছে যায়। ফিসফিস কথা হয়।]

হারাধন ॥ তা বাবুমশায়, আসন নিন। জোলাপাড়ার সঙ ঢুকছে।

[সবাই স্থির হয়ে বসে। জোলাপাড়ার সঙ ঢোকে। জোলাপাড়ার

সঙ্-এর গান]

॥ গান ॥

বাবুরা গরীব গরীব সাজ পরেছে গায়।
বাবুদের ছ্যানাপোনা,
ভুল বলছি না,
সভ্যিরে ভাই, নেংটি পরে ইস্কুলে যায়॥
বাবুর বিবি পরে চুড়িদার,
বাবু লুঙ্গি পরে যায় বাজার,
ধুতি শাড়ির দিন গিয়েছে,
মোদের পরাণ রাখা দায়॥

হারাধন॥ তাহলে উপায়?

॥ গান ॥

ভাই জোলাপাড়ার মাকু চলে,
আজ সরকারী দাদন পেলে,
ওরে ভাই,
সেই দাদন পেতেও আগাম লাগে,
কি করি উপায়…।
বাবুরা গরীব গরীব সাজ পরেছে গায়॥

[জোকারের মুখোশ এঁটে একজন দৃশ্যে ঢোকে। সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে।]

মুখোশ॥ রহস্য, রোমাঞ্চ, রীতিমতো নাটক।

একব্যক্তি॥ এটি আবার কার সঙ্?

মুখোশ॥ [ছড়া কাটে]

এখনই পাইবে বাছা মোর পরিচয়,
আগে কিছু কেজো কথা,
শোন মহাশয়।
সঙের দিনেতে কেন, কাঁধে খাটখানি,
বাতাসে শোন হে দাদা।
কার কানাকানি॥

একব্যক্তি ॥ তুমি কাদের সঙ্ ?

মুখোশ ॥ পাকুড়তলার সঙ্ ।

হারাধন ॥ চালাকি ছাড়ো। বলো কে ?

[মুখোশ পান্না সাপুই-এর সঙ্ একব্যক্তিকে ঠেলে ধরে তুলে আনে ।]

মুখোশ ॥ [ছড়া কাটে]

আসল নকল করে,
লাগায়েছো ধাঁধা,
বলে দাও সকলেরে,
পান্নালাল দাদা,
কালরাতে কি হইল,
পাকুড়তলায়—
বলে ফেলো এইবার,
সকল জনায় ॥

একব্যক্তি ॥ কাল রাতে ?

মুখোশ ॥ রাত বলে রাত। একেবারে মাঝ রাত।

হারাধন ॥ কি বলতে চাও শুনি।

মুখোশ ॥ মামদোদের মিটিং।

সবাই একসঙ্গে ॥ মিটিং।

মুখোশ ॥ হ্যাঁ কি করে সঙ্ বন্ধ করা যায় তার মিটিং।

হারাধন ॥ সঙ বন্ধ করার মিটিং ? কি ভাবে !

মুখোশ ॥ এই ভাবে [বলে একখানা কাগজ বের করে। তাতে বড় বড় হরফে লেখা, "এবারে সঙ্ বন্ধ থাকবে"]

শিবু ॥ [ছুটে গিয়ে কাগজখানা কেড়ে নেয়] এটা কোথায় পেয়েছো ?

মধু ॥ বলো এটা কার কাজ ?

মুখোশ ॥ এই আল্লার কিরে দিচ্ছি, ওকাজ আমার নয়।

হারাধন ॥ আল্লা ? [কাছে গিয়ে] কি বললে আল্লার কিরে। [মুখোশটা ছিঁড়ে দেয়] আরে ! শোভান আলী, তুমি ?

মুখোশ ॥ এবারে বিশ্বাস হল।

মধু ॥ শোভান চাচা ?

শিবু ॥ বাঁচালে। তোমাদের পাড়া থেকে সঙ্ না এলে এবারে গোটা পরব

মিথ্যে হয়ে যেতো। কিন্তু ঐ লেখাটা?

মুখোশ॥ তাহলে রহস্য আগে বোঝো।

মধু॥ এর পরেও বুঝতে হবে চাচা?

মুখোশ॥ বুঝতে হবে বাপ। [ছড়া কাটে]

কোন কাজে মাঝ রাতে

পাকুড়তলায় যমদোরা সব,

কিসের খেলায় মাতে?

বাবুপাড়ার মাথারা সব

কেন হলো জড়ো,

সেই কথাটা বুঝে নিয়ে-

নোটিশ খানা পড়ো॥

হারাধন॥ মাঝ রাতে বাবুপাড়ার মাথারা সব—

মুখোশ॥ তবে আর কি বলছি। বিকেল থেকে বাবুপাড়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরছি। পরবের দিনের জন্য বাবুদের জামা চাই। সেখানেই তো জানতে পেলাম, নিত্যচরণ যে বাবুদের নামে গান বেঁধেছে। বাবুরা তা জানে।

মধু॥ তাহলে ব্যাটারা জানতে পেরেছে।

মুখোশ॥ জানা বলে জানা। সেকি রাগ তেনাদের। তা আমাকেই বুদ্ধেশুদ্ধি বানালে। মাষ্টার বললে, যাচ্ছিস তো খগেনবাবুর বাড়ি, বলে দিস। খগেন বললে, যাচ্ছো তো ওদিক, দুর্যোধনকে বলে দিও। দুর্যোধন বললে, খবরটা পান্না সাঁপুই যেন পায়, মাঝ রাতে পাকুড়তলায়।

হারাধন॥ এতো লম্বা কিস্যা?

মুখোশ॥ তবে আর বলছি কি। পান্না সাঁপুই জামা কিনলে। বখশিস দিলে। তারপরই নেশার ঘোর ধরলে চেপে হুকুম করলে, "নিত্যচরণ আমায় নিয়ে যে কেচ্ছা লিখেছে তা শোনা।"

শিবু॥ তারপর?

মুখোশ॥ নেশার ঘোরে গুলিয়ে ফেলে আমায় বলতে লাগলো, 'নিত্যচরণ যদি গান ভালো বেঁধে থাকিস তো তোকে একজোড়া ধুতি দেবো। গান শোনা।'

হারাধন ॥ তুমি গান শোনালে, এইতো ? তার সঙ্গে পাকুড়তলার সম্পর্কটা কি বলবে তো ?

মুখোশ ॥ সাঁপুই বললে, গানও শোনা হবে, মিটিংও করা হবে। চল আমার সঙ্গে পাকুড়তলায়।

হারাধন ॥ কিন্তু নেশা ছেড়ে যেতে পারা সাঁপুইর কথাটা মনে পড়েনি বলতে চাও ?

মুখোশ ॥ পড়বে।

মধু ॥ তাহলে ?

মুখোশ ॥ তোমরা দশজন আছো, আমার একার ভাবনা ? তা ছাড়া সাত গাঁয়ের মানুষকে পরবের দিন সত্যি কথাটা জানাবোনা। একে একে সবকটা মামলা ভিড় করার আগে আমি আঁধারে গা ঢাকা দিলাম। ওদের সব কথা শুনলাম। শুনলাম সব কটাতে পণ করেছে এবারকার সঙ্ বন্ধ করবে।

হারাধন ॥ তাই ঐ নোটিশখানা লিখে হাজির হয়েছো। সাবাস শোভান ওস্তাগর।

শিবু ॥ জয় শোভান চাচার জয়।

মুখোশ ॥ বল, সাত গাঁয়ের জয়।

[সবাই একসঙ্গে। জয় সাত গাঁয়ের জয়।] এই জয়ধ্বনির মধ্যেই সঙ্গে লোকজন নিয়ে সুজন পাল দৃশ্যে ঢোকে]

সমবেত ॥ এসেছে, এসেছে...।

একব্যক্তি ॥ একি নাক নেই। মুখ নেই ! এ কেমন সঙ !

সুজন ॥ এটাই এবারকার পালপাড়ার সঙ।

মধু ॥ ঐ খড়ো কার্তিক।

সুজন ॥ [সবাইকে উদ্দেশ্য করে] নে সবাই হাত লাগা, এবারে সঙ্ সাজাই, আরে ! শোভান আলী না ! ওস্তাগর পাড়ার মুরুব্বি না থাকলে সঙ্ সাজবে কেমন করে। হাত লাগাও হে শোভান।

[সুজন পালের ডাকে শোভান আলী এগিয়ে যায়। শিবু কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ায়। সঙ্ সাজানো চলতে থাকে]

শিবু ॥ পালপাড়া থেকে মূর্তি চুরি গেছে, আমরা সবাই জানি ?

হারাধন ॥ হাঁ শুনেছি।

শিবু ॥ কিন্তু কারা চুরি করলো ? সঙ্-এর মূর্তি চুরি করলো কারা ?

হারাধন ॥ সেটাই সকলকার প্রশ্ন।

শিবু ॥ কেনো ! সঙ্ দেখে ভয় পেয়েছে যারা।

হারাধন ॥ এতো মজার কথা ! সঙ্ দেখে ভয় !

শিবু ॥ হ্যাঁ ভয়। [সুজন সাজানো বন্ধ রেখে এগিয়ে আসে]

সুজন ॥ সঙ্ তো শুধু সঙ্ নয়। সঙ্ এর ভেতর দিয়ে সাত গাঁয়ের মানুষেরা দুনিয়ার সঙ্গে কথা কয়। সেই কথাটাকেই ভয়।

শিবু ॥ এর একটা বিহিত করতে হবে।

সুজন ॥ সবাই চাইলে হবে। তার আগে একটু হাত লাগাও হে বাপধনেরা।

একব্যক্তি ॥ ভালো করে সাজাও। খুড়ো কাত্তিকে মজা নেই।

সুজন ॥ হবে, সব হবে। গান হবে বাজনা হবে। কৈ হে, তোমার জামাটা দাও হে। নকল সাঁপুই চাদরখানা ছাড়ো হে।

[একজন জামা খুলে দেয়। এক ব্যক্তি তার কাঁধ থেকে চাদর খানা দেয়]

শিবু ॥ এ যে বাবুদের সাজ হয়ে গেল !

সুজন ॥ আহা ! সঙেরও তো সাজ গোজ করতে মন চায় !

একব্যক্তি ॥ নাও, আচ্ছা করে সাজাও। ততক্ষনে আসর জমুক।

হারাধন ॥ সবাই এবারে গা তোলো।

সুজন ॥ এবারে যারা সঙ সেজেছো সবাই একত্রিত হও। মাটির মূর্তি চুরি হয়েছে তো কি হয়েছে। রক্ত মাংসের মানুষের আছে না !

[একে একে সবাই দাঁড়ায়। পদ্মকে দাঁড়াতে দেখে]

সুজন ॥ [পদ্মকে লক্ষ্য করে] একি ! ঘরের বৌ এখানে কেনো ?

হারাধন ॥ ও এবারকার মেয়ে সঙ কর্ত্তা।

সুজন ॥ ঘরের বৌ-কে শেষ পর্যন্ত সঙ্ সাজাবি হারা ?

হারাধন ॥ না হলে ভুজঙ্গ দারোগার পাপের কেচ্ছা তো বলা যাবেনা খাল কর্ত্তা ?

শিবু ॥ এবারে শুরু করুন খুড়ো মশায়।

সুজন ॥ বড্ড ব্যস্ত যে রে ! নে, তোরা সব গলা মেলা। [ছড়াকাটে] সঙ্ দেখতে রঙ্ মেখেছি, ভাবছো বুঝি হারবে ?

সমবেত ॥ ভাবছো বুঝি হায় রে।

সুজন ॥ এক বছরে একটিতো দিন, তাকি ছাড়া যায় রে ?

সমবেত ॥ তাকি ছাড়া যায়রে ?

॥ ছড়া ॥

সঙ্-এর মধ্যে কথা থাকে
রঙ্-এও থাকে শুনি,

সেই কথা সব ভালো করে,
বুঝিবেন আপনি।

সমবেত ॥ বুঝিবেন আপনি।

সুজন ॥ মন্ত্রপড়া শেষ। নে শিবে এবারে শুধোতে আরম্ভ কর।

শিবু ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] সাত গাঁয়ের জন্য আমাদের কি চাই ?

সমবেত ॥ শান্তি চাই।

শিবু ॥ সেই শান্তি পেতে হলে কি করতে হবে ?

সমবেত ॥ অন্যায় অবিচার বন্ধ করতে হবে।

সুজন ॥ বাঃ সাত গাঁয়ের মানুষ হাজার বিপদেও ভয় পায় না। তাইনা সাতগাঁ সোনার গাঁ ! !

শিবু ॥ সবাই ফর্দি দাও গো। ফর্দি দাও।

[এই সময় প্রায় নিঃশব্দে পায়া সাঁপুই ভুজঙ্গ দারোগা জনতার পেছনে এসে দাঁড়ায়]

শিবু ॥ [আবার] ফর্দি দাও। ফর্দি চাই।

একব্যক্তি ॥ কার কি কি চাই বলে ফ্যালো !

হারাধন ॥ মহাজনের জুলুম বন্ধ কর।

শিবু ॥ থানার হয়রানি বন্ধ কর।

মধু ॥ আদালতে বিচার পেতে দেরি আমরা সইবোনা।

পদ্ম ॥ মা বোনেদের ইজ্জৎ রাখতে হবে।

শিবু ॥ সবার জন্য কাজ চাই।

সুজন॥ [খুশিতে] বেশ ! তা শেষমেষ কি চাই ?

সমবেত ॥ সাত গাঁয়ে শান্তি চাই।

সুজন ॥ মস্ত বড় ফর্দি যে হে ! তা পাবে কি করে ?

সমবেত ॥ লড়াই করে।

শিবু ॥ লড়াই করার শক্তি চাই।

সুজন ।। সঙ্ তোলো। সঙ্ তোলো।

যারা সঙ দেখতে এসেছেন তাদের কোন আপত্তি আছে ?

ছড়া

পাকুড় গাছ সাক্ষী

আর সাক্ষী সর্বজন।

আসছে বছর সঙে

সবার রইল নিমন্ত্রণ।

যা চলবেনা, তা পোড়াও ভাইরে

যা চাই তা নাও কেড়ে।

পাকুড় তলার সঙের ঠাকুর,

তারে প্রণাম দেরে ।।

[সবাই প্রণাম করে]

সুজন ।। এস এই সঙটিতে আগুন লাগাই। [হঠাৎ পান্না সাঁপুই গর্জে ওঠে]

পান্না ।। খবর্দার। বিপদ হবে খবর্দার।

সমবেত ।। [ফিরে দেখে] কে ওখানে।

পান্না ।। তোদের যমন। ভেবেছিস সঙ-এর ভয়ে আমরা ল্যাজগুটিয়ে বসে থাকবো।

সুজন ।। ছিঃ ছিঃ ল্যাজ কি গোটাবার জিনিস সাঁপুই ?

ভুজঙ্গ ।। চোপ। কোন কথা নয়। তুমি ব্যাটা বুড়ো ভাম সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকেছো।

শিবু ।। মুখ সামলে বলছি।

ভুজঙ্গ ।। তোর ভয়ে ছুঁচো [তাড়া করবে]

হারাধন ।। তোমরা সঙ্ ভাঙ্গতে এসেছো তাইনা ? [দর্শককে] বন্ধুগণ। যারা সঙ্ দেখতে এসেছেন, তাঁরা একবার দেখুন। কি ভাবে ঐ ওরা আমাদের পরবের দিনগুলো পর্যন্ত বিষিয়ে দেয়।

পান্না ।। সঙ্ ? এতো সঙ-এর নাম করে তোদের ছোটলোকি।

শিবু ।। কি বললে ?

পান্না ।। সামলে শিবে। মনে রাখিস, কাল রাত পোহালেই সঙ্-এর রঙ্ মুছে যাবে।

সুজন ।। দেখো, এই পাকুড়তলার দিব্যি দিয়ে বলছি, আজকের পরবের দিনটাকে তোমরা অমান্য করোনো।

ভুজঙ্গ ।। আব্দার। তোমরা জমায়েত করবে থানার হুকুম নেবেনা।

পান্না ।। মেলা বসাবে, মানী লোকদের নেমতন্নের করবে না। আবার উল্টে কর্তব্য বোঝাচ্ছো। পরব বলেই, নেমন্তের পরোয়া না করে, এসেছি। আমার বাপদাদা যেমন আসতো।

সুজন ।। তাহলে আর গোল কি সে?

পান্না ।। কিন্তু একি সঙ্? এতো আগুন লাগানোর মতো দিচ্ছো সবাই মিলে।

শিবু ।। তাহলে তোমরা থামবে না?

ভুজঙ্গ ।। কভি নেহী।

শিবু ।। ভাইসব তোমরা এইসব নকল সঙের পাল্লায় পড়ো না।

হারাধন ।। শিবে! সঙের আবার আসল নকল!

শিবু ।। হাঁ। সঙকে যারা আসল ভেবে ভয় পায় তারাই নকল সঙ।

হারাধন ।। তাহলে এরাও সঙ। ঐ দারোগা এই স পিুই মশায়।

শিবু ।। হ্যাঁ সবাই। তাইতো বলছি কি পোড়াবে?

হারাধন ।। [বিনীত ভাবে] যদি অভয় পাইতো বলি।

সুজন ।। আরে বল। বেলা যে যায়।

হারাধন ।। এবারে সব ভয় গুলোরে পোড়াতে হবে কর্তা।

সুজন ।। কি বলছিস! ভয়?

শিবু ।। হ্যাঁ ভয়। পেয়াদার ভয়, হাকিমের ভয়। মন্ত্রীর ভয়, আমলার ভয়। দালালের ভয়, মহাজনের ভয়। মোল্লার ভয়, পুরুতের ভয়। সবার শেষে বাবুদের ভয়।

[ভুজঙ্গ স্বভাবমতো লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে আসে]

ভুজঙ্গ ।। সব কটাকে চালান করবো।

শিবু ।। এই না হলে পুলিশ। বলি চোর ডাকাত না ধরে সঙ ধরার কাজ কবে হলো?

ভুজঙ্গ ।। কি!

সমবেত ।। সাবধান নকল সঙেরা।

[বিপদ বুঝে পান্না সাপুই ভুজঙ্গকে টেনে নিয়ে চুপচাপ পিছনে গিয়ে

দাঁড়ায়]

সুজন ।। দিবে, ওদের ছেড়ে দে। সঙ্-এর দিনে ওদেরও তো ভাগ আছে।
আজ যে পাকুড়তলা সকলকার রে!

হারাধন ।। কিন্তু খুড়ো…।

মুখোশ ।। কোন কিন্তু নয়। ওরা সঙ বন্ধ করতে চেয়েছিল পারেনি! জিৎ
তো আমাদের। এত ভয় কিসের?

সুজন ।। সবাই উঠে এসো। এসো এবারে ভয়গুলোকে পোড়াই।

[সবাই উঠে দাঁড়ায়। যন্ত্র চালিতের মতো পান্না এবং ভুজঙ্গও এগিয়ে
আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাধা পায়]

হারাধন ।। আরে করো কি। এবার থেকে তোমাদের ভয়গুলো যাতে, আরো,
থাকো তার জন্যেই না এত কিছু!

পান্না ।। এ কিন্তু অন্যায়।

সুজন ।। থামো স'াপ্‌ট। সঙ দেখতে জড়ো হওয়া মানুষেরা বলতে চাও
বোকা? তারা কিছু দেখেনি এতক্ষণ বলতে চাও। আমাদের এত
আয়োজন সব মিথ্যে হয়েছে। ভাবছো?

[ভুজঙ্গ এবং পান্না হতাশভাবে বসে পড়ে। ক্রমশ একে একে সবাই
উঠে দাঁড়ায়। তাদের ভিড়ে আড়াল হয়ে যায়, ভুজঙ্গ আর পান্না
স'াপ্‌ট। কেউ একজন কুশপুত্তলিকায় আগুন লাগায়। সমবেত
মানুষজনের ধ্বনি দিয়ে ওঠে]

সমবেত ।। জয় সাত গাঁয়ের জয়।

জয় সাত গাঁয়ের মানুষের জয়।

[আগুনের শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে। আগুনকে ঘিরে একটা
মানুষের বৃত্ত। নেপথ্যে গান শোনা যায়]

আগুন লাগাও আগুন লাগাও
আগুন লাগাও।
ভয় পোড়াও ওরে
সহজ হবে, শক্তি হবে,
লড়তে সারা বছর ধরে ।।

[সাত গাঁয়ের জয়ধ্বনি ফিরে ফিরে শোনা যায়]

—শেষ—